হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে
তানসেনের স্থান

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ
প্রণীত
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মূল্য আড়াই টাকা

(তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৪)

প্রিণ্টার—শওকত আলি
সঙ্গীত প্রেস
৬০নং হরি ঘোষ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

আমার সঙ্গীতগুরু পরম শ্রদ্ধাভাজন

পরলোকগত

৺মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব রবাবী

ও

উজির খাঁ সাহেব বীণকারের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

প্রকাশকের নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ প্রকাশক)

তানসেনের নাম বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত থাকলেও তাঁকে রক্ত মাংসের মানুষরূপে সাধারণ পাঠকবর্গের সম্মুখে, বোধ করি, গ্রন্থকারই উপস্থিত করলেন এই প্রথম। তানসেনের প্রতিভার ক্রমিক বিকাশের কথা—তাঁর পূর্ণ উদ্যমে খ্যাতিপথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টাপ্রসঙ্গ এক কথায় তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত এতদিন আবদ্ধ ছিল "আইনী আকবরী" "পাদশানামা" প্রভৃতি বিখ্যাত অথচ স্বল্প পরিজ্ঞাত দুর্ভেদ্য গ্রন্থদুর্গের পাষাণ প্রাচীরের অভ্যন্তরে। সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল একমাত্র অনুসন্ধিৎসু প্রখ্যাত প্রতিভাশালী পণ্ডিতবর্গের। তথাকার অমূল্য রত্নরাজির সন্ধান শুধু তাঁরাই জানতেন কিন্তু জনসাধারণকে তা জানাবার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্যও কোনদিন প্রদর্শন করতেন না। গ্রন্থকার সেই চিরপ্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করে, পাষাণ প্রাচীরের নীরব নেপথ্য থেকে সঙ্গীতসম্রাট তানসেনের জীবন-কাহিনী আহরণ করে এনে বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে আজ সাদরে উপহার দিচ্ছেন। এই ধরণের সুলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল।

আখ্যাত বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ অখণ্ডভাবে আকৃষ্ট করা, নায়ক নায়িকার ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা বর্ণনা দ্বারায় পাঠককে উৎফুল্ল কিম্বা উদ্বিগ্ন করা লেখকের লিপিকুশলতার পরিচায়ক বলেই পরিগণিত হয়ে থাকে। তানসেনের জীবন-কাহিনীতে গ্রন্থকারও উক্তরূপ লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় প্রায় সর্ব্বত্রই প্রদান করেছেন। ফলে

কালের ব্যবধান অন্তর্হিত হয়েছে—যিনি সঙ্গীতানুরাগী ও সঙ্গীত-কলাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকটে এতদিন নামে মাত্র পর্য্যবসিত ছিলেন—জনসাধারণ যাঁকে বহুদিন আগেশোনা পুরাণো বাজে কথার মত ভুলে গিয়েছিল, আজ তিনিই সহসা সঞ্জীবন মন্ত্রে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, বিস্মৃতি সাগরের বীচিবিক্ষোভ অতিক্রম করে, আমাদের সম্মুখে পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর মত এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা নির্ব্বাক বিস্ময়ে মুগ্ধ নেত্রে তাঁর মুখপানে চেয়ে আছি—আনন্দের পুলক শিহরণে কণ্টকিত হয়ে উঠছি এবং সম্রাট আকবরের রাজসভায় তাঁর অতুলনীয় প্রতিষ্ঠালাভ দেখে আনন্দে ও গৌরবে উল্লাসিত হচ্ছি।

কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের প্রসঙ্গ উঠলে বিদ্বজন প্রতিপালক মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের স্মৃতি স্বতঃই মানসপটে যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তেমনি তানসেনের কথা বল্‌তে গেলেও যাঁর রাজচ্ছত্রের সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ ছায়াতল ছিল মনীষার একমাত্র বিকাশভূমি, কোহিনূরকল্প অমূল্য অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাশালী পণ্ডিতদিগকে দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে এনে রাজসভা সুশোভিত করাই ছিল যাঁর একমাত্র ব্যসন, সেই মহামনীষী গুণগ্রাহী দাতা সম্রাট আকবরের স্মৃতি প্রসঙ্গতই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে এবং আশঙ্কা হয় যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু না বল্‌লে তানসেনের কীর্ত্তিকাহিনী বুঝিবা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সত্যসত্যই সম্রাট ছিলেন অসাধারণ গুণগ্রাহী—গুণের কিছুমাত্র পরিচয় পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন এবং সেই গুণী ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করে তাঁর গুণের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করতেন। তাঁর রাজত্বকালে—"দারিদ্র্যদোষঃ গুণরাশিনাশীঃ" কথাটী প্রকৃত-পক্ষেই কিয়ৎ পরিমাণে নিরর্থক হয়ে গিয়েছিল। সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গের মুখে লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরবিরোধের কথা শুন্‌লেও, মহানুভব সম্রাটের

দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল যে, দারিদ্র্যের নিদারুণ দুর্দ্দিনে পেচকের পক্ষ নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন রাজহংসের আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই থাকে না। তিনি নিশ্চিতই জানতেন যে, কমলার বরপুত্রগণের সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে বাণীর প্রিয়তম একনিষ্ঠ সেবকগণের প্রতিভার জ্যোতিঃ ম্লান হয়ে পড়ে—কারো কারো জীবনস্রোত হয়ত সংসার মরুভূমির ঊষর বালুকাক্ষেত্রে অকালে ধারাহীনও হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসীও তাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি থেকে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়। এ কথাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না যে—

"ক্রতৌ ব্যসনে বিবাহে রিপুক্ষয়ে
যশস্করে কর্ম্মনি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষু ধনেষু বন্ধুষু—
ধনব্যয়স্তেষু ন গণ্যতে বুধৈঃ॥"

বহু অর্থব্যয়ে তাই রাজারাম বাঘেলার দরবার থেকে তানসেনকে দিল্লীতে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি নিরস্ত থাকেন নাই—ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত দেশের সর্ব্বজাতীয় গায়কগণকেই অনুসন্ধান করে এনে নিজের রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন—সাধারণের অবগতির জন্য তাঁদের নাম "আইনী আকবরী"কার আবুল ফজলের উক্তি সহ উদ্ধৃত নিম্নে করা যাচ্ছে :—

The Imperial Musicians.

"I can not sufficiently describe the wonderful power of this talisman of knowledge (Music). It sometimes causes the beautiful creatures of the harem of the heart to shine forth on the tongue and sometimes appears in solemn strains by means of the hand and the chord. The melodies then enter through the window of the ear and return to their former seat, the heart, bringing with them thousands of presents. The hearers, according to their insight, are moved to sorrow or to joy. Music is thus of use to those who has renounced the world and to such as still cling to it."

"His Majesty (Akbar) pays much attention to music and is the patron of all who practise this enchanting art. There are numerous musicians at Court. Hindus, Iranis, Turanis, Kashmirics, both men and women."

"The Court musicians are arranged in seven divisions. One for each day in the week. When His Majesty gives the order, they let the wine of harmony flow, and thus increase intoxication in some and sobriety in others. A detailed description of this class of people would be too difficult, but I shall mention the principal musicians."

"1. Miyan Tansen * of Gwalior a singer like him had not been in India for the last thousand years.

Raja Ramchand Baghelah was the patron of this renowned musician and Singer Tansen. His fame had reached Akbar and in the 7th. year emperor sent Jalaluddin Quirchi to Bhatah to induce Tansin to come to Agrah. Ramchand feeling powerless to refuse Akbar's request, sent his favourite with musical instruments and many presents to Agrah and the first time that Tansin performed at the Court, the emperor made him a present of two lakhs of rupees. Tansin remained with Akbar. Most of his compositions are written in Akbar's name and his melodies are even now-a-days, everywhere repeated by the people of Hindusthan."

"2. Baba Ramdas § of Gwalior, a singer,"
3. Subhan Khan of Gwalior, a singer.
4. Surgyan Khan „ „ „
5. Miyan Chand „ „ „

---

* Ram Chand is said to have once given Tansin one crore of Tankha as a present. Ibrahim Sur, in vain, persuaded Tansin to come to Agrah. Abul Fazul mentions below his son Tantarang Khan and the Padishanama mentions another son of the name of Bilas.

§ Badauni says Ramdas came from Lucknow. He appears to have been with Bairam Khan during the rebellion and Bairam once received from him one lakh of Tankah, empty as Bairam's treasure chest

was. He was first at the Court of Islam Shah and he is looked upon as second only to Tansin. His son Surdas is mentioned below.

6. Bichitr Khan, brother of Subhan Khan, a singer.

7. Mahammad Khan Dhari, sings.

8. Birmandal Khan of Gwalior, plays on the Surmandal.

9. Baz Bahadur, Ruler of Malwah, a singer without rival.

10. Shahab Khan of Gwalior performs on the Bin.

11. Daud Dhari * sings,

12. Sarod Khan of Gwalior—sings.

13. Miyan Lal ‡ of Gwalior—sings,

14. Tantarang Khan, son of Miyan Tansin—sings.

15. Mulla Ishaq Dhari—sings,

16. Usta Dost of Mashad—plays on the flute Shahnai,

17. Nayak Charju of Gwalior, a singer,

18. Purbin Khan—his son, plays on Bin.

19. Surdas, son of Baba Ram Das, a singer.

---

* Dhari means a singer—a musician.

† Jahangir says in Tuzuk that Lal Kalawant

(or Kalanwat a singer) died in the 3rd. year of his reign, "Sixty or rather seventy years old. He had been from youth in my father's service. One of his concubines on his death, poisoned herself with opium. I have rarely seen such an attachment among Muhammadan women."

20. Chand Khan of Gwalior—sings.

21. Rang Sen of Agrah—sings.

22. Shaikh Dewan Dhari performs on the 'Karana"

23. Rahamatulla, brother of Mullah Ishaque a singer.

24. Mir Sayed Ali, of Mashad plays on the "Ghichak."

25. Usta Yusuf of Harat, plays on Tambura.

26. Quasim surnamed Koh bar.* He has invented an instrument intermediate between the "Qubaz" and "Rabab."

27. Tash Beg of Quipchag, plays on Qubaz.

28. Sultan Hafiz Hussain of Mashad Chants.

29. Bahram Quli of Harat, plays on the Ghichak.

30. Sultan Hashim of Mashad, plays on the Tambura.

31. Usta Sha Mahammad plays on the "Surna"

32. Usta Mahammad Amin, plays on the Tamburah.

33. Hafiz Khwaja Ali of Mashad, chants.

34. Mir Abdullah, brother of Mir Abdul Hai, plays on the "Qanun."

"35. Pirzadah* Nephew of Mir Dewan of Khurasan, sings and chants.

36. Usta Muhammad Hossain †, plays on the Tamburah."

---

* Koh-bar, as we know from Padishanama, is the name of a Chagtaitribe. The "Nafaisul Maasir" mention a poet of the name of Mahammad Quasim Koh-bar whose Nam-de plume was Cabri.

* Pirzada according to Badaoni, was from Sabzwar He wrote poems under the "Takhallus" of Liwai. He was killed in 905 at Lahore by a wall falling on him.

† The Misiri Rahimi mentions the following musicians in the service of the Khankhanan :—

(1) Agah Muhammad Nai, son of Haji Ismail of Tabriz, (2) Maulana Aqwati of Tabriz. (3) Usta Mirja Ali Fatagi. (4) Maulana Sharaf of Nishapur, a brother of the poet Naziri (5) Muhammad Mumin alias Hafizak, Tamburah player (6) Hafiz Nazar from Transoxiana, a good singer.

তানসেনের সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের কিংবদন্তীর অভাব নাই—কিন্তু এগুলির পরস্পরের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলের ভাগ এতই বেশী যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটা একটা গ্রহণ করলে অবশিষ্ট-গুলিকে সামঞ্জস্যের অভাবে পরিত্যাগ না করেই পারা যায়না।

'নহমূলাঃ জনশ্রুতিঃ" বা "Shade without substance" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্যগুলিকে এ সমস্ত ক্ষেত্রে অচল বলেই মনে হয়। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কৃতী ব্যক্তিবর্গের তিরোধানের পরে তাঁদের স্মৃতিকে অবলম্বন করে সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের গল্প সকল দেশেই অন্ধ Hero worshipperদের দ্বারা রচিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকের সত্যানুসন্ধী দৃষ্টিতে এ সমস্ত গল্প নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলেও বাস্তবিকপক্ষে এগুলি আদৌ অবজ্ঞার বস্তু নয়, কারণ এর দ্বারাই আমরা নির্ভুলভাবে মৃত ব্যক্তির জনপ্রিয়তার পরিধির পরিমাপ করতে সমর্থ হই—তাই এই সমস্ত গল্প যাঁর সম্বন্ধে যত বেশী প্রচলিত তিনিই তত বেশী দিন জগতে জনসাধারণের স্মৃতিতে জীবিত থাকেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের মনে হয় তানসেনের সম্বন্ধে এই ধরণের গল্পগুলি অবাধে বহুল পরিমাণে সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়েছিল বলেই আজও তাঁর নাম সঙ্গীতবেত্তাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং যতদিন ভারতবর্ষে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তানসেনের কীর্ত্তিকাহিনী কখনও বিস্মৃতি-কুহেলিকায় আবৃত হবে না। কীর্ত্তিমান্ বোধ করি এই ভাবেই চিরদিন জীবিত থাকেন। সম্ভবতঃ এই বিষয়টী লক্ষ্য করেই পণ্ডিতেরা বলেছেন :—

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতিঃ।"

যৌবনে হরিদাস স্বামীর কাছথেকে তানসেন যে ধর্ম্মশিক্ষা পেয়েছিলেন, পরিণত বয়সে সেই শিক্ষাই তাঁকে একেশ্বরবাদী করে তুলেছিল। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন সঙ্গীতের একজন একনিষ্ঠ সাধক এবং সেই সাধকোচিত মনোবৃত্তি প্রণোদিত হয়েই জীবনের অপরাহ্নে সঙ্গীতকে ধর্ম্মসাধনের উপায়স্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অক্লান্ত

কৃচ্ছ্র সাধনায় পরিশেষে যখন সত্যের "কোটীসূর্য্যপ্রতিকাশং কোটীচন্দ্র-সুশীতলং" ভাস্বর দীপ্তি তাঁর নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, তখনই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গেয়েছিলেন :—

‡"প্যারে তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেষ, তুঁহি মহেশ।
তুঁহি আদ, তুঁহি অনাদ, তুঁহি নাদ, তুঁহি গণেশ॥

জলস্থল মরুত ব্যোম
তুঁহি অকার যমসোম
তুঁহি অকার তুঁহি মকার
নিরোঙ্কার, তুঁহি ধনেশ।
তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ
তুঁহি হদীশ তুঁহি কোরাণ
তুঁহি ধ্যান, তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ভুবনেশ॥
তানসেন কহে খান তুঁহি, দেন তুঁহি রমন।
তুঁহি ঘর পলয়ুন
তুঁহি বরুন তুঁহি দানেশ॥

যশোমণ্ডিত সুদীর্ঘ জীবনের পরিশেষে, নির্ম্মল আকাশে অস্তগামী দিনপতির দিনান্তের অবসানের মত দীপ্ত গৌরবের রক্তসমুদ্রে সহসা যে দিন তাঁর জীবন তরণী নিমজ্জিত হ'য়ে ছিল সে দিন কেবল যে আগ্রা নগরী এবং তদানীন্তন ক্ষুদ্রায়তন মোগল সাম্রাজ্যই নিদারুণ শোক বেগে মূহ্যমান হয়েছিল তা নয়, সে মর্ম্মন্তুদ বিয়োগ দুঃখ প্রবাহ সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষকেও নিঃশেষে পরিপ্লাবিত ও আলোড়িত

---

‡ বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত।

করেছিল। "আইনী আকবরী" প্রণেতা আবুল ফজল যথার্থ ই লিখেছেন—"তানসেনের ন্যায় গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যেও একজন জন্মে নাই।" তানসেনের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী গায়কগণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে আবুল ফজলের এ মন্তব্যকে কোনক্রমেই অতিশয়োক্তির পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না।

তানসেনের স্বরচিত গান অদ্যাপি দুষ্প্রাপ্য হয় নাই বটে, কিন্তু এখনও যে গুলি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কোনটী তাঁর নিজের রচনা কোন্‌টী অপরের তা সঠিক বলা কঠিন। নিম্নে আমরা তাঁর প্রথম বয়সের রচিত একটী গান উদ্ধৃত কচ্ছি :—

†*"মনগজভরো অরসমান অত প্রবল চবড়হে প্রচণ্ড সঠ দরিদ্র অষ্টান কোরী। মনগজ-টেক।

উরব তুরব ধুন্ধকার মদন দুহাই তাকী ঘরতানা ঘর গাড়ে সনমুখ হোত জাকোঁ শুণ্ডবারো॥

মন-১

ইমন্দ ইমন্দ কীমন্দ কুকব বহু প্রবল ফুঁণী ফুঁমকারো ; তানসেনকোঁ ভারেক'রে আগেশুব একদন্ত দুজী শুণ্ডমে উঠারো।

মন ২।

"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" সর্ব্বথা মুদ্রাকরপ্রমাদ পরিশূন্য হয় নাই। আশাকরি সুধীবর্গ অবসরহীন অক্ষম প্রকাশকের অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশিষ্টের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিত জগন্নাথ কবিরাজেরই মতান্তরে অন্য নাম জনার্দ্দন কবিরাজ। কেহ কেহ এঁকেই ভাবভট্টের পিতা জনার্দ্দন ভট্ট বলে ধরে নিয়েছেন। ৺ভাতাখণ্ডেজীও এই মতই পোষণ কর্ত্তেন।

তানসেনের সময়ে পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল ও ভাবভট্টের পিতা জনার্দ্দন ভট্ট জীবিত ছিলেন। তানসেনের সম্বন্ধে তাঁরা কেউ কিছু লেখেন নাই। ভাবভট্ট তাঁর "অনুপবিলাস" নামক গ্রন্থে তানসেনের আবিষ্কৃত 'দরবারী কানাড়া' সম্বন্ধে লিখেছেন—"জো দরবারী সো শুদ্ধ কহাবে" মূল গ্রন্থের ১৬১ পৃঃ "ক্ষেত্রমোহন ঠাকুরের" পরিবর্ত্তে ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর পড়িতে হইবে। প্রকাশকের নিবেদনের প্রথম পৃষ্ঠায় "উৎসুক্য"র স্থলে "ঔৎসুক্য" ৩য় পৃষ্ঠায় কৃত্তিকাহিণী"র স্থলে কীর্ত্তিকাহিণী এবং ৫ম পষ্ঠায় Mwsicins এর স্থলে "musicians" পড়লেই পাঠ ঠিক হবে।

---

* বিশ্বকে হইতে উদ্ধৃত।

‡* গানটী গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত ভবনগরবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দহালাল শীবরাম মহাশয়ের "সঙ্গীতকলাধর" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

গৌরীপুর
রথযাত্রা।
১৩৪৫ সাল।

বিনীত প্রকাশক
শ্রীবীরেশ্বর বাগছি বি, এ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" পুস্তকখানি বাংলা সন ১৩৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়; এবং ইহা পাঠ করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। বাংলার সঙ্গীত—রসিকগণ ইহার প্রশংসায় উচ্ছসিত হন। কিছুদিন মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকগুলিও অল্পদিন মধ্যে নিঃশোষিত হইয়া যায়। তানসেন এবং তাঁহার সঙ্গীত সম্বন্ধে জনসাধারণের ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ কত বেশী ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানির বিষয় বস্তু আইনী আকবরী', পাদশানামা' রিসালা তানসেন, খুলাসাতুল তানসেন, প্রভৃতি কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রচনা করিয়াছেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-পরিবারের নিকট হইতেও এই পুস্তক রচনা বিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। কেননা তানসেনজীর পুত্রবংশীয় রবাবী আলি মহম্মদ খাঁ ও দৌহিত্রবংশীয় বীণকার উজীর খাঁ এই ইতিহাস তাঁদের শিষ্যদের নিকট বিবৃত করেন, ঠাকুর রাজগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং এই পুস্তকখানি তানসেনের জীবন-কাহিনীর একটী প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কারণে এই পুস্তকটীকে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত পুস্তকের তালিকায় সাদরে স্থান দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের জীবনী ও সঙ্গীত সম্বন্ধে জানিবার অধিকতর আগ্রহ

জন্মিয়াছে। এমতাবস্থায় এবং জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার নিমিত্ত ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ফিল্মে তানসেনের ইতিহাস নানা কল্পনা ও অলীক ঘটনা জালে জড়িত করিয়া সাধারণের নিকটে পরিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে জনসমাজের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে তাহা দূর করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান সংস্করণে পূর্ব্বেকার ভ্রম প্রমাদ যথাসম্ভব সংশোধন করার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি ইহা পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

প্রকাশক—

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৪

পূর্ব্বাভাষ

সংগীত বিদ্যা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন কালের বিশিষ্ট সংগীত আচার্য্যদের নাম সংগীত রত্নাকরে পাওয়া যায়, যথা— বিসাখিল, দন্তিল, কশলে, বায়ু, বিশ্বাবসু, রম্ভা, অর্জ্জুন, নারদ, তুম্বুরু, হনুমান, মাতৃগুপ্ত, রাবণ, নন্দিকেশ্বর, বিষ্ণুরাজ, ক্ষেত্ররাজ রাহল, রুদ্রসেন, ভোজ, সোমেবা এবং ব্যাখাকর্ত্তাদের মধ্যে লোল্লাট, উদ্ভট, সঙ্কুট, অভিনব গুপ্তধর।

হিন্দুস্থানী সংগীতের চুড়ান্ত উৎকর্ষ হরিদাস স্বামীর সময়ে দেখা যায়।

সকল সংগীত আচার্য্যগণই সামবেদকে সংগীতের উৎপত্তি মেনে থাকেন। ব্রহ্মা হইতে বেদ-এর উৎপত্তি। মতান্তরে মহাদেব পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি রাগ ও পার্ব্বতির মুখ হইতে একটি—এই ছটি রাগের উৎপত্তি করেন। তারপর ব্রহ্মা ছয় রাগকে ছয় ঋতু অনুযায়ী

ছয় রাগের ব্যবহার করেন। যেমন গ্রীষ্মে দীপক, বর্ষায় মেঘ, শরৎএ ভৈরব, হেমন্তে শ্রী, শীতে মলকোষ, বসন্তে হিন্দোল। এই ছয় রাগের ছয়টি করিয়া ভার্য্যা হিসাবে ছত্রিশ রাগিণীর উৎপত্তি হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসে পাই, যদিও ইহার কোন প্রমাণ নাই। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্রহ্মা শিবের নিকট ছয় রাগের সহিত ৩৬ রাগিণী যোজনা করে ভরত, নারদ, রম্ভা, হাহা, হুহু, তুম্বুরু এদের সংগীত শিক্ষা দেন। উহারা ইহা হইতে ৪৮টি উপরাগ সৃষ্টি করেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের সভায় লবকুশের সংগীত চর্চ্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে কৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে বৃন্দাবন প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তখন ১৬০০০ গোপিনীরা প্রত্যেকে এক একটি রাগিণী সৃষ্টি করতে পুরানে ১৬০০০ রাগিণীর নাম পাওয়া যায়। অর্জুন একজন উৎকৃষ্ট নর্ত্তক ও গায়ক ছিলেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় বৃহন্নলারূপে বিরাট রাজার সংগীত অধ্যাপক হন। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির রাজ্য পাওয়ার পর সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেন। ২০০০ খৃঃ পূঃ কায়েনের প্রপৌত্র জুবাল হার্পের সৃষ্টি করেন। তাহা বাজাইয়া উপাসনা ও অন্যান্য উৎসব কার্য্য হইত। অন্ধ কবি হোমার ট্রয়ের যুদ্ধের সময় (১১৮৩ খৃঃ পূঃ) হার্প বাজাইয়া গ্রীকদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ৩৩০ খৃঃ পূঃ আলেকজাণ্ডারের দরবারে গান বাজনার চর্চ্চার ইতিহাস পাওয়া যায়। পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমানদের ভেরী বাজাইবার উদাহরণ পাওয়া যায়। ৪০ খৃঃ পূঃ ক্লিওপেট্রার দরবারে সংগীত চর্চ্চার (হার্প ইত্যাদি) পরিচয় পাই।

৮৩৬ খৃঃ বোগদাদের হারুণ-অল-রসিদ সংগীতের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। মামুদ অব গজনির (১০১৭খৃঃ) কনৌজ আক্রমনের সময়

৬০০০০ গায়ক ছিল। সোমনাথ মন্দিরে ২০০ বেতনভোগী গায়ক ছিল। ১৩০০ খৃঃ আলাউদ্দিনের সময়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রথম ব্যবহার হয়। বৈজু বাওরা হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের প্রথম স্রষ্টা। ইনি সংস্কৃত ধ্রুব, প্রবন্ধ, ছন্দ হইতে ধ্রুপদের সৃষ্টি করেন।

নায়ক গোপাল দাক্ষিণাত্য থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে বাদশার দরবারে স্থান পান এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের রূপ দেন।

আমীর খসরু পারস্যের একজন অভিজাত বংশীয় কবি, গায়ক ও রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি পারস্য সংগীতের সহিত হিন্দুস্থানী সংগীতের মিশ্রণ করেন।

কিন্তু প্রথম হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রাথমিক রূপ বিখ্যাত কবি জয়দেবের কাছে পাই। তিনি কেন্দুবিল্বতে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার গীতগোবিন্দ কৃষ্ণলীলায় পরিপূর্ণ এবং এই সকল কবিতাই বহু বিখ্যাত রাগ ও তান গঠিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ হিন্দুস্থানী সংগীতে অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তথাপি তৎকালীন রাগরাগিণীর রূপ বর্ত্তমানে নির্ণয় করা বর্ত্তমানে সহজসাধ্য নয়। তবে আলাউদ্দিন খিলজির সময় (১৪০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে) দিল্লীর পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনের দরবারে হিন্দুস্থানী সংগীতের যে প্রাথমিক পরিচয় পাই এখনও তার ঐতিহ্য লুপ্ত হয় নাই। ঐ সময় আলাউদ্দিন পারস্য দেশ থেকে আমীর খসরুকে নিমন্ত্রণ করে আপন সভায় বিশিষ্ট সম্মানিত আসন দেন। আমীর খসরু একাধারে কবি, দার্শনিক, সংগীতজ্ঞ ও রাজনিতীক ছিলেন। আলাউদ্দিনের দরবারে তাঁর আসন শুধু কলাবিদ হিসাবে নয়—মন্ত্রী ও ধর্ম্মগুরু হিসাবেও বিশিষ্ট মর্য্যাদা পেয়েছিলেন তিনি শেষ জীবনে ফকীর হন। ইনি সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এঁর রচিত গান এবং কবিতাতে গুজরাটী, পারস্য ও সংস্কৃত

ভাষায় সমন্বয় দেখা যায়। ইনি গুজরাটেও অনেকদিন ছিলেন। গায়ক হিসাবেও তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ঐ একই সময় দাক্ষিণাত্য হ'তে নায়ক গোপাল নামক একজন দিগ্বিজয়ী গায়ক ও পণ্ডিত আলাউদ্দিনের সভায় উপস্থিত হন। আলাউদ্দিন তাঁকেও স্থায়ীভাবে দিল্লীর দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। শোনা যায় নায়ক গোপাল যে সকল রাগ রাগিণী আলাপ করতেন আমীর খসরু সেই সব রাগ রাগিণী অন্তরাল হ'তে শুনে পরে পারস্য ভাষায় এক একটি নাম দিয়ে গেয়ে শুনাতেন। যাহা হউক নায়ক গোপালই হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতির প্রথম সূত্রকর বা প্রথম ঔপপত্তিক রূপকার। আমীর খসরু কতকগুলি পারস্য সুর এদেশে প্রচলিত করেন। সেগুলির নাম—সাজগিরী, য়মন বা ইমন, ও সাক, মাফেঁস বা দেওয়ান, জীলফ, সরফরদা। তাছাড়া ফিরদস্ত প্রভৃতি তাল তাঁর তৈয়ারী। আমীর খসরু পারসিক পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় রাগ-রাগিণী গাইতেন। তাঁর পদ্ধতিতে ১২টি মোকাম বা রাগ, ২৪টি সুবা বা রাগিণী ও ৪৮টি গুস্তা বা উপরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

নায়ক গোপাল কতকগুলি রাগ সৃষ্টি করেন। যথা—পূর্বী, গৌরী গুণকেলী, খট ও দেশকার।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে বৈজু বাওরা নামে তৃতীয় সংগীত-কলাবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজু সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি জঙ্গলে বাস করিতেন। শোনা যায় তাঁর গানের সময় বন্য জন্তু জানোয়াররাও মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হোতো। তাঁর প্রতিভার কথা আলাউদ্দিনের গোচর হ'লে বাদশা তাঁকে দরবারে আহ্বান করেন। ঐ সময় নায়ক গোপাল ও আমীর খসরু দরবারে ছিলেন।

বৈজুর কণ্ঠস্বর ও গান তাঁদের অপেক্ষাও অনেক শ্রুতিমধুর ছি।
পাণ্ডিত্যে নায়ক গোপাল ও আমীর খসরু শ্রেষ্ঠ হলেও কলাবিদে
তুলনা ছিলনা। নায়ক গোপাল প্রাচীন ধরণের ছন্দ প্রবন্ধযুক্ত
হিন্দুস্থানী গান গাইতেন কিন্তু বৈজু চার তুক বা কলি বিশিষ্ট ধ্রুপদ
গানের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। ধ্রুপদের চার তুকের নাম স্থায়ী,
অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। এই সময় হইতেই ছন্দ, প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে
ধ্রুপদই হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীতে প্রধান স্থান অধিকার করে। বৈজু
দরবারে বেশী সময় থাকতেন না। কিন্তু তাঁর প্রবর্ত্তিত ধ্রুপদ পদ্ধতি
অনুসরণ করে গোপাল নায়ক অনেক ধ্রুপদ রচনা করেন। তাঁদের
রচিত ধ্রুপদের পদ্ অতি সুললিত ও মধুর। বৈজু ও গোপাল
নায়কের পর ২০০ বৎসরের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীর সংগীতনায়ক দেখা
যায়নি। কারণ এই সময় উত্তর ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের দরুণ উচ্চ
সংস্কৃতির চর্চ্চার অবকাশ কমে গিয়েছিল। তারপর ১৬০০ শতাব্দী
প্রারম্ভে গোয়ালিয়রের মহারাজা মান (ইনি জয়পুরের মানসিংহ নন)
হিন্দুস্থানী সংগীতের পুনরুত্থান করেন। ইনি একজন বিখ্যাত সংগীত
প্রিয় রাজা ছিলেন। এঁর রাজত্বকাল ১৪৮৬ হতে ১৫১৬ পর্য্যন্ত ৩১
বৎসর ছিল। ইনি মৃগনয়নী নামক গুজরাটী রাজকন্যাকে বিবাহ
করেন। কর্ণেল ক্যানিংহামের "Archiological Rep rt of
Gowalior" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে মহারাজা মান মালব-গুর্জ্জরী
মঙ্গল-গুর্জ্জরী, ও বাল-গুর্জ্জরী প্রভৃতি রাগ সৃষ্টি করেন। মৃগনয়নী সংগীত
শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্না ছিলেন। মহারাজা মান-এর পরলোক গমনের পরও
রাণী মৃগনয়নীর সভায় সংগীতের বিশেষ অনুশীলনের ইতিহাস পেয়ে
থাকি।

১৪৮৬—১৫১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা মান। রাজা মানের মৃত্যুর পর

তাযায় * রাণী মৃগনয়নীর গান শুনতে এলেন। তখন তানসেনে গায়ক ২০ বৎসর। তানসেনের জন্ম তাহলে বোঝা যায় ১৫০৬ খৃঃ। 'এক' বৎসর বয়সে তিনি রাণী মৃগনয়নীর দরবারে আসেন। তার আগে তিনি হরিদাস স্বামীর কাছে ১০ বৎসর শিক্ষা করেছিলেন। ১০ বৎসর বয়সে পিতামাতার সঙ্গ ত্যাগ করে হরিদাস স্বামীর কাছে হরিদ্বারে উপনয়ন এবং শিক্ষা আরম্ভ করেন। শিক্ষার পর বাড়ী পৌছাবার পরই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তখন মাকে নিয়ে আবার বৃন্দাবনে রওনা হন। পথে মাতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর পিতা বলে যান হজরত মহম্মদ গওসের সঙ্গে তিনি যেন অবশ্য দেখাকরেন।

* মিয়া তানসেনের বিস্তৃত জীবনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত হল।

হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান

মিঁয়া তানসেনের কথা আর্য্যাবর্ত্তের আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই আজও স্মরণ করে। এখনও তাঁর স্মৃতি হিন্দুস্থানে অমর হয়ে রয়েছে—বোধ করি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এই ধরাতলে যতদিন গীত হবে—রাগ-রাগিণীগুলির নাম শত রূপান্তরের মধ্যে দিয়েও যতদিন বিলুপ্ত একেবারে না হবে, ততদিন তানসেনের নাম কেউ ভুলতে পারবে না এবং জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি এমন দুর্দ্দিন হিন্দুস্থানে যেন কখনও না আসে যেদিন তানসেনের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতির সাগরে ডুবে যাবে। কিন্তু যতদিন হিন্দুস্থানের মাটি সম্পূর্ণ ক্ষয় না পাবে, যতদিন হিন্দু সঙ্গীত ব'লে একটা কিছু থাকবে—ততদিন তানসেন নাদবিদ্যারূপিণী বাগ্‌দেবীর বরপুত্ররূপে চিরদিনই কলাবিৎ ও গুণী সমাজে শুধু নয়, আবালবৃদ্ধবণিতা সবারই অন্তরে শ্রদ্ধা ও পূজার আসনে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকেন—সঙ্গীতের হীনতম সাধক আমি আজ

যুক্তকরে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে এই প্রার্থনাটি শুধু নিবেদন ক'রে আমার পুস্তক আরম্ভ করতে চাই।

মিয়া তানসেনের সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই অনেক গল্প, আখ্যায়িকা প্রভৃতি আমরা শুনে এসেছি—কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই বেরিয়েছে—আমি তাই তাঁর সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের ও সঙ্গীতরসিকদের হৃদয়ে সত্যকার অনুসন্ধিৎসা জাগাবার জন্য এই পুস্তক লিখছি। যাঁরা তানসেনের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য জানবার জন্য যথার্থ উৎসুক, তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখিত অকবর বাদশাহের দরবার সম্বন্ধীয় বিবরণে কতক কতক জানতে পারবেন ও আরো বিস্তৃত সব বিবরণ জানতে পারবেন 'তুহফতুল হিন্দ', 'খুলাসতুল এশ', 'কনীজুল অফাদাত,' 'নুরুল হেদায়ত' ও পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ সাহেবজাদা সাদত আলি খাঁ সাহেব প্রণীত 'ফিলাসফী মৌসিকী' নামক পুস্তক পাঠে। আমরা বহু চেষ্টায় উপরিলিখিত পুস্তকের দু'একটি জোগাড় করেছিলাম—তদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য্য শাস্ত্রী প্রণীত সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক পাঠেও আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের কিছু কিছু উপকরণ পেয়েছি—তানসেনের বংশধর পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ্ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের মুখে ও তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ উজীর খাঁ সাহেবের বর্ণনায়ও বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণিত বিবরণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদ্ভিন্ন অধুনা অমুদ্রিত একটি প্রাচীন বাংলা পুস্তকেও আমাদের বিবরণের সহিত হুবহু মিল অনেক বিবরণ দেখেছি। সেই পুস্তকও সত্যানুসন্ধিৎসু জনৈক সঙ্গীত-রসিক বিরচিত। সর্ব্বোপরি All India Musical Conferenceএর দিল্লী অধিবেশনে ৺সাদত আলি খাঁ সাহেব

তানসেনের জীবনী, তাঁর বিদ্যাবত্তা ও তাঁর বংশপরম্পরা সম্বন্ধে ইংরাজীতে বিশদভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—উৎসুক পাঠকগণ তা' পড়তে পারেন—All India Musical Conference-এর দিল্লী অধিবেশনের বিবরণীতে তা'র সংক্ষেপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হবে।

লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ ঠাকুর তাঁর 'মআরিফুন্নগমাৎ' নামক সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, "আধুনিক গান বিদ্যা কিসী সংগীত গ্রন্থকে অনুসার নহী হৈ। লেকিন জো রিবাজ আজকাল প্রচলিত হৈ, উস্‌কা প্রমাণ অগর কঁহী মিল্ সকতা হৈ তো তানসেন কে খানদান সে। য়েহ খানদান জলালুদ্দিন মহম্মদ আকবর্ আজম্ কে সময় সে অব তক্ গান বিদ্যা কোন অভিজ্ঞোঁ মে অদ্বিতীয় হ্যা।" অর্থাৎ আধুনিক গান বিদ্যার প্রমাণ মাত্র তান্‌সেন্ ও তাঁর বংশাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায়। কোনও সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের হিন্দুস্থানী সংগীত মেলে না। এ কথাটা আমাদের খুবই মনে রাখা উচিত। আজকাল রাগ-রাগিণীর যে সব রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত সে সবের স্রষ্টা নারদ, ভরত হনুমান্ বা কোনও ঋষি মুনি নয়। তাঁদের সৃষ্টিধারা বহু রূপান্তরের মধ্যে দিয়া আধুনিক আকার লাভ করেছে। এখনকার রূপান্তরের মধ্যে যাঁর প্রেরণার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় তিনি তানসেন ভিন্ন আর কেহ নন্। তান্‌সেন্ ও এই প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু স্বামী হরিদাসের কাছ থেকে। বর্ত্তমান সঙ্গীতের যুগকে তানসেনের যুগ বলতে পারি। স্বামী হরিদাস অন্তরে সঙ্গীতদেবীর যে মন্ত্র ও যে ধ্যান মূর্ত্তি সাধারণ প্রেরণায় পেয়েছিলেন, তানসেন তাই জগতের সামনে শরীরী করে তুলেছেন। স্বামী হরিদাস দেবর্ষি নারদেরই অবতার ছিলেন। তবে তাঁর সৃষ্টি ছিল

ভগবৎ পদারবিন্দে অঞ্জলি দিবার জন্য,—তানসেন্ সেই সৃষ্টির উৎস থেকে একটি ধারা জগতের দিকে বহিয়ে দিলেন জগতকে সঙ্গীত সুধাস্রোতে সুশীতল করবার জন্য। বর্ত্তমান সঙ্গীত-মন্দাকিনীর পিতা স্বামী হরিদাস আর তানসেন্ ভগীরথের মত সেই প্রবাহকে আবাহন করে আনলেন সুরতরঙ্গিণী জাহ্নবীর মতই জগতের অসংখ্য তৃষিত তাপিতজনের অন্তর জুড়াতে।

আবুল ফজলের ইতিহাসে আমরা পাই, তানসেনের জন্মের পূর্ব্বে এক হাজার বৎসরের মধ্যে তাঁর সমতুল্য গুণী ও সঙ্গীতস্রষ্টা কেহ জন্মান নি। অবশ্য তাঁর গুরু স্বামী হরিদাসের কথা স্বতন্ত্র। তা ছাড়া নায়ক, গুণী, গন্ধর্ব্ব যাঁরা পূর্ব্বে জন্মেছিলেন, যাঁদের কথা তখন সবার স্মরণ পথে পড়ত, তাঁদের কেউই তানসেনের ছায়ারও তুল্য ছিলেন না এবং আবুল ফজলের ধারণা ছিল যে, সঙ্গীতের এমন নবী বুঝি দুনিয়ায় আর কোনওদিন আবির্ভূত হবে না। অথচ আমরা চাই দুনিয়ায় সৃষ্টিধারা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করুক, শত তানসেন্, শত হরিদাস আবার হিন্দুস্থানে আবির্ভূত হন। যা ছিল তার চেয়ে বড় কিছু আসবে না এ কথা কে বলবে?

তবে এটা সত্য যে, স্মরণাতীতকালের কথা বাদ দিলে ঐতিহাসিক যুগে সঙ্গীতের যে নিদর্শন সব আমরা পাই তাতে বেশ প্রতীতি জন্মে যে, স্বামী হরিদাস ও তানসেনের যুগেই সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

সঙ্গীতের যুগ-পূর্ব্ববর্ত্তী বহু শতাব্দীর সাধানায় স্বামী হরিদাস ও তানসেনের যুগের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

তানসেনের যুগ সম্বন্ধে সঠিক বুঝতে হলে তার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় থেকে আমাদের আলোচনা সুরু করতে হবে। আমরা সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প

ও সভ্যতার সব ক্ষেত্রেই এই সত্য লক্ষ্য করি যে, যখনই লোকোত্তর মহৎ কিছুর আবির্ভাব হয়েছে তার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা অত্যন্ত অবনতিসূচক মলিন ও তমোগ্রস্ত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিভবতি ভারত"। সব ক্ষেত্রেই একথা খাটে। আর্টেরও যখন চরম গ্লানির অবস্থা আসে তখন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনও শিল্পীর আবির্ভাব হয়। জগতের আশ্চর্য্য সমস্ত সৃষ্টিরই এই রহস্য। প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোকেরা সেই সূক্ষ্ম জগতের শক্তিরই লীলার যন্ত্র—সূক্ষ্ম জগদ্বাসী দেববৃন্দের বাহন মাত্র।

দেবতাদের কৃপা কালসাপেক্ষ। কাল যে আসন্ন হয়েছিল তাই তানসেনের জন্মের পূর্ব্বেকার ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পাই। আমি বলেছি যখনই কোনও অভাব দারুণ আকার ধারণ করে, যখন সবই অন্ধকার মনে হয়, কোথাও কোন চিহ্নই দেখা যায় না, তখনই বুঝতে হবে আশার আলো জ্বলবার আর বিলম্ব নাই। চরম অবস্থাই অভ্যুত্থান এবং পতনের পূর্ব্ব নিদর্শন। সঙ্গীতের সব চেয়ে অন্ধকারের যুগ মোগল ও পাঠান রাজত্বের সন্ধিক্ষণ।

১৩০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাঠান সম্রাজ্যের অবসানে ও 'বৈজুবাওযা,' গোপাল নাযক ও আমির খসরুর তিরোধানের পর প্রায় দুই শত বৎসর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুশীলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রাণস্পন্দন প্রায় বন্ধই ছিল বলতে হবে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ মানসিংহকে গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা রূপে আমরা দেখতে পাই। ইনি ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৩১ বৎসরকাল গোয়ালিয়রে রাজত্ব করে গেছেন। ইহার পত্নী গুর্জ্জর-রাজকন্যা

রাণী মৃগনয়নী সঙ্গীতবিদ্যায় অসামান্যা ব্যুৎপত্তিশালিনী ছিলেন।
" মহারাজ মানসিংহ ও রাণী মৃগনয়নী উভয়েই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুনরুত্থানের অগ্রদূত তাতে সন্দেহ নাই। তাঁদের রচিত ও তাঁদের উদ্দেশ্যে রচিত বহু গান এখনও আমরা পাই। ইহা পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

তানসেনের জীবনেও রাণী মৃগনয়নীর দান সামান্য নয়। সে কথা আমরা যথাসময়ে বিবৃত করব। মহারাজ মানসিংহ যে তানসেনের সুরের অগ্রদূত, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই। মহারাজ মান তানসেনের জন্মের দশ বৎসর পুর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন, রাণী মৃগনয়নী আরও বহুদিন বেঁচেছিলেন।

তানসেনের পিতার নাম মুকুন্দরাম পাঁড়ে। কেহ কেহ তাঁর নাম মকরন্দ পাঁড়েও বলেন। মুকুন্দরামও সুগায়ক ছিলেন, তিনি বারাণসীতে কথকতায় জীবিকা উপার্জ্জন করতেন ও পাণ্ডিত্যে ও সঙ্গীতে জনসাধারণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, অর্থও তাঁর ছিল প্রচুর। কিন্তু সংসারে একটা তাঁর বড় দুঃখ ছিল, তাঁর পত্নীর মৃতবৎসার দোষ ছিল। তানসেনের বা রামতনুর পূর্ব্বেও তাঁর অনেকগুলি পুত্রসন্তান জন্মেছিল কিন্তু একটিও রক্ষা পায়নি। রামতনুর পূর্ব্বে তিনি খবর পান যে, গোয়ালিয়রে হজরত মহম্মদ গওস্ নামক এক সিদ্ধ পীর আছেন, তিনি মৃতবৎসা দোষ দূর করতে পারেন। এই সংবাদ পেয়ে মুকুন্দরাম গোয়ালিয়রে যাত্রা করেন ও হজরত গওস্ তখন তাঁকে একটী কবচ দিয়ে বললেন যে, কবচটি তাঁর পত্নীকে কণ্ঠে ধারণ করতে হবে ও সন্তানের জন্মের পর সন্তানের কণ্ঠে সেটাকে দিতে হবে। তা'ছাড়া কিছু কিছু নিয়মপ্রণালীও ব'লে ভাবী সন্তান রক্ষা তো পাবেই পরন্তু সে এক অদ্বিতীয় বিদুষীশালী

যশ্রেষ্ঠরূপে পরিণত হবে। এর কিছুদিন পরই (১৫০৬ খৃঃ অব্দে) রামতনুর জন্ম হয়। রামতনুই মুকুন্দরামের একমাত্র পুত্র।

রামতনু বাল্যে বড় দুরন্ত ছিলেন। বালক রামতনু পাঠাভ্যাস মোটেই করেন নাই—রামতনু কেবল মাঠে জঙ্গলে গঙ্গাতীরে, হয়ত ক্ষেতে গরু চরিয়ে বেড়াতেন। রামতনু ছিলেন একেবারে প্রকৃতিরই আদুরে শিশু। মুকুন্দ ও তাঁর পত্নী রামতনুকে শাসন কর্‌ত না, কেননা রামতনু তাঁদের একমাত্র ও বড় কষ্টে পাওয়া সন্তান। এইভাবে রামতনুর দশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়। বালক রামতনুর একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল—যে কোনও রূপ স্বরই তিনি শুন্‌তে পেতেন তারই অবিকল অনুকরণ তিনি করতে পারতেন, যাবতীয় জীবজন্তুর ডাক নকল কর্‌তে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন ও তাঁর নকল স্বরে সবারই ভ্রম জন্ম্‌ত।

এই সময়েই রামতনুর সঙ্গে পরম ভক্ত দিব্য গায়ক স্বামী হরিদাসের সাক্ষাৎ হয়। সে এক দৈব সংযোগ—এই সময় স্বামী হরিদাস শিষ্যমণ্ডলী সহ বারাণসী তীর্থ দর্শনে এসেছিলেন। তাঁরা যখন বারাণসীর সীমানায় এসে পৌছলেন, তখন সেখানে বনে রামতনু গোচারণ কর্‌ছিলেন। এক অপরিচিত শিষ্য পরিবৃত সন্ন্যাসী দেখে রামতনু কৌতুকচ্ছলে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে বাঘের ন্যায় ভয়ানক শব্দ করতে সুরু কর্‌লেন। তাতে শিষ্যেরা সব ভয় পেয়ে গেল। হরিদাস স্বামী বারাণসীর কাছে বাঘের অবস্থিতি সম্ভবপর নয় ভেবে শিষ্যদের চারিদিকে দেখতে বল্‌লেন। শিষ্যেরা অচিরেই রামতনুকে গাছের আড়াল থেকে বের করে ফেল্‌লেন ও স্বামীজীর সম্মুখে এনে হাজির কর্‌লেন। স্বামীজী বালক রামতনুর অপরূপ রূপলাবণ্য ও সিদ্ধজনোচিত লক্ষণাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে তার পিতার কাছে গেলেন ও তাকে শিষ্য ক'রে সাথে নিয়ে যেতে চাইলেন। পিতা মুকুন্দরামও তাঁর প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি

দান করলেন। এই সময়ই রামতনুর সঙ্গীতদীক্ষা হ'ল ও গুরু-শিষ্য উভয়েই বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। রামতনুর বা তানসেনের অমর-সঙ্গীত জীবনের এখানেই সূত্রপাত। রামাতনুর বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র।

এইখানে স্বামী হরিদাসের সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার। ভক্তমাল গ্রন্থে আমরা পাই, হরিদাস স্বামী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁর সন্ন্যাসজীবনের সহিতই ইতিহাস পরিচিত—তিনি বালব্রহ্মচারী ছিলেন অথবা গার্হস্থ্যের পর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন তা, জানা যায় না। তবে ইতিহাসে আমরা পাই যে, তিনি বৃন্দাবনে নিধুবনে থাকতেন ও তথায় বঙ্কুবিহারী নামক এক মণিময় শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। প্রবাদ এই যে, এই মূর্তিটি মাটিতে প্রোথিত ছিল, হরিদাস স্বামী প্রত্যাদেশ পেয়ে তা' মাটি থেকে উদ্ধার করেন ও তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। হরিদাস স্বামী একজন সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন, এ কথা আমরা ইতিহাসে পাই—তাঁহার অর্থলোভ মোটেই ছিল না, নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কাম ও প্রকৃত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তিনি ছিলেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অনেকে তাঁকে দেবর্ষি নারদের অবতাররূপে কীর্ত্তন করে থাকেন।

হরিদাসের অপ্রাকৃতী ভাবই সঙ্গীত-ধারায় বিগলিত হ'য়ে ভগবৎ পদে উৎসৃষ্ট হয়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গীতও অপার্থিব এবং দিব্য গরিমায় মণ্ডিত ছিল, তা' শ্রবণের সৌভাগ্যও খুব কম লোকেরই হয়েছিল—শুধু তানসেনই সেই অমর সঙ্গীত শ্রবণ ও শিক্ষার অধিকার পেয়েছিলেন তানসেনের প্রতি হরিদাস স্বামীর এক অহৈতুক কৃপাই তার কারণ। এই দিব্য মহাপুরুষের কৃপা তানসেনের অতি বাল্যে, দশ বৎসর বয়সেই লাভ করলেন। বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাসের নিকট রামতনু দশ বৎসর একাদিক্রমে বিদ্যা শিক্ষা করার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতাও তার অল্পকাল পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতা মুকুন্দরামের অন্তিম

শয্যায় রামতনু উপস্থিত হন। ঐ সময় পিতা পুত্রকে শেষ কথা ব'লে যান যে, তিনিই রামতনুর একমাত্র পিতা নন্, রামতনুর আর এক পিতা আছেন তাঁর নাম হজরত মহম্মদ গওস্, তিনি গোয়ালিয়রে থাকেন। মুকুন্দরাম রামতনুকে তাঁর শেষ উপদেশ দিয়ে গেলেন যে রামতনু হজরত গওসের পরামর্শ যেন কখনও অবহেলা না করেন।

বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে, পিতার অন্তিম আদেশ রামতনু হরিদাস স্বামীকে জানালেন ও স্বামীজীর অনুমতিক্রমে হজরত মহম্মদ গওসের সাক্ষাৎলাভের জন্য গোয়ালিয়রে যাত্রা করলেন। গোয়ালিয়রে হজরত মহম্মদ গওসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মহম্মদ গওস্ রামতনুকে বললেন "তুমি এইখানে বাস কর, আমার সব বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হও, আমি তোমার বিবাহ দিয়ে তোমায় সংসারী করে দিই।" রামতনু হজরত গওসের এই অনুগ্রহে অত্যন্ত কৃতার্থ বোধ করলেন ও কিছুদিন গোয়ালিয়রে বাস করলেন। এই সময়ে রামতনু শুনতে পেলেন যে, গোয়ালিয়রের মৃত মহারাজ মানসিংহের বিধবা পত্নী রাণী মৃগনয়নী অতি উৎকৃষ্ট গায়িকা। রামতনু রাণী মৃগনয়নীর গান শুনবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হওয়ায় হজরত গওস তার উপায় করে দিলেন। রাণী সাহেবার দরবারে মহম্মদ গওসের অতুল প্রতিপত্তি ছিল। তিনি রাণীকে অনুরোধ করে রাজবাটীতে রামতনুর নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন। রামতনু নিমন্ত্রিত হ'য়ে রাণী মৃগনয়নীর গান শুনলেন ও নিজে স্বামী হরিদাসের নিকট যা শিক্ষালাভ করেছিলেন তাও শোনালেন। রাণী রামতনুর গানে পরম সন্তোষলাভ করলেন ও প্রত্যহই তাঁকে নিমন্ত্রণ করা সুরু করলেন। মৃগনয়নীর সঙ্গীত-মন্দিরে রামতনুর নিত্য যাতায়াতে ক্রমশঃ রামতনুর হৃদয়-মন্দিরে এক নব দেবীমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা শীঘ্রই সূচিত হ'ল। রাণী মৃগনয়নীর অনেক শিষ্যা ছিলেন—তন্মধ্যে হোসেনী

ব্রাহ্মণী নাম্নী এক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা ব্রাহ্মণললনা সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও সুমধুর সঙ্গীতে রামতনুকে আকৃষ্ট ক'রে ফেল্‌লেন। উভয়েই উভয়ের প্রতি নিবিড় প্রণয়ে অভিভূত হ'য়ে, পরস্পরকে লাভের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন।

রাণী মৃগনয়নী রামতনুকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন—হোসেনীর প্রতি রামতনুর এই প্রেমসঞ্চার সন্দর্শনে, তাঁদের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করতে তাঁরও যথেষ্ট আগ্রহ হ'ল। হোসেনীর প্রকৃত নাম প্রেমকুমারী। তাঁর পিতা সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে সপরিবারে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। প্রেমকুমারী তাঁরই কন্যা। প্রেমকুমারীর ইস্‌লামী নাম 'হোসেনী' রাখা হয়—ব্রাহ্মণকন্যা ব'লে তাঁকে সবাই হোসেনী ব্রাহ্মণী বলে ডাকত।

মৃগনয়নী এই প্রেমকুমারীর সঙ্গে রামতনুর বিবাহ দিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে হজরত গওসকে এক পত্র লিখলেন। গওস রামতনুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হোসেনীকে প্রাপ্ত হ'লে তিনি সত্যি সুখী হবেন কিনা। রামতনু তাঁর পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করলেন ও হোসেনীকে বিবাহ ক'রে জাতিচ্যুত হ'তে রাজী হ'লেন। রামতনুর সম্মতি গওস রাণীকে জানাবার পর অচিরেই উভয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল। রাণী মৃগনয়নী প্রেমকুমারীর পিতাকে আহ্বান করলেন এবং নিজে বর ও কন্যা উভয় পক্ষেরই কর্ত্রী হ'লেন—হজরত মহম্মদ গওস্ পৌরোহিত্য সম্পাদন করলেন। এই বিবাহের পর রামতনুর নাম মহম্মদ অতা আলী খাঁ রাখা হ'ল। বিবাহ উপলক্ষে মহম্মদ আতা আলী খাঁ রাণী মৃগনয়নী ও হজরত গওসের নিকট থেকে বিস্তর টাকা যৌতুক স্বরূপে পেয়ে বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর শ্রীচরণে পুনরায় ফিরে এলেন ও সমস্ত ঘটনা তাঁকে নিবেদন করলেন। স্বামীজির উদার হৃদয়ে জাতিভেদ ছিল না—

তিনি রামতনু ও মহম্মদ আতা আলীর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখ্‌তে পেলেন না ও পূর্ব্বের মতই তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ ক'রে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা সম্পূর্ণ করলেন।

হরিদাস স্বামীর উদারতায় তানসেন অন্তরে বাহিরে তাঁর চিরদিনের কেনা গোলা'মের মতই হয়ে গেলেন—গুরুই তাঁর জীবনের একমাত্র উপাস্য ও ধ্যান জ্ঞান ছিল—জাতে মুসলমান হলেও গুরুমন্ত্র ও গুরুদত্ত যোগ তিনি হারাননি। স্বামী হরিদাস তানসেনকে সঙ্গীতের যৌগিক সাধনা সর্ব্বাঙ্গীনরূপেই দিয়েছিলেন—সেই সাধনাই তানসেনকে চিরদিন কামধেনুর ন্যায় সুরের অক্ষয় রসধারা জুগিয়েছে ও কল্পবৃক্ষের মত ইচ্ছাফল প্রসব করেছে। 'দেবদেবীরা রাগরাগিণীরূপে মূর্ত্তি নিয়ে তানসেনের কাছে চিরদিনই ধরা দিয়েছেন।

তানসেনের দাম্পত্যজীবনও নিষ্ফল হল না। তানসেনের রসিকা বিদগ্ধা পত্নী সঙ্গীতে সিদ্ধা ছিলেন—তাঁদের উভয়ের প্রণয় নাদবিদ্যার সেবায় দিন দিন গাঢ়তর মধুরতর হয়ে উঠ্‌ল। এই সময় গোয়ালিয়রের ফকির গওসের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়ে এল। ফকীর সাহেব তানসেনকে ডেকে পাঠাবা মাত্র হরিদাস স্বামী তানসেনকে অবিলম্বে গোয়ালিয়র যেতে বল্লেন। তানসেন ফকির সাহেবের অন্তিম দশায় অকৃত্রিম ভক্তির সহিত তাঁর সেবা করে মরণোন্মুখ ফকীরকে তৃপ্ত করলেন ও ফকীরের শেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করলেন।

ফকীর সাহেবের ধনরত্নের অভাব ছিল না—সে সমস্তই তিনি তানসেনকে মৃত্যুশয্যায় দান করে গেলেন। তানসেন তারপর কিছুদিন সপরিবারে গোয়ালিয়রে বাস করেন। তবে, স্বামী হরিদাসের নিকটে যোগসাধনা ও সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নিয়মিত ভাবেই তিনি বরাবর যেতেন। স্বামী হরিদাস তানসেনকে দুইশত ধ্রুপদ শিক্ষা দান করেন ও

যৌগিক সপ্তচক্রে সাতস্বরের প্রকাশ যোগবলে কি ভাবে সম্ভব হয়, সে সঙ্কেতও তানসেনকে দিয়েছিলেন—গুরুশক্তির প্রভাবে কালে তানসেনও নাদসিদ্ধ হলেন।

সংস্কার-আশ্রম ত্যাগ করে তানসেনকে সন্ন্যাসী হতে হয়নি। সংসারে থেকেই তাঁর সাধনা সফল হ'ল। সঙ্গীত সাধনাকালে তানসেনের চারি পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্রদের নাম সুরতসেন, শরৎসেন, তরঙ্গসেন, ও বিলাস খাঁ—কন্যার নাম ছিল সরস্বতী। এঁরা সকলেই নাদবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং উত্তরকালে সকলেই যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভ ক'রে বংশগৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

তানসেনের সাধনা যখন পূর্ণপ্রায়, সেই সময় রেওয়ার মহারাজ রাজারাম বৃন্দাবন থেকে তানসেনকে তাঁর দরবারে নিয়ে যান—রেওয়ার সভাগায়করূপে তানসেন কয়েক বৎসর রেওয়ায় ছিলেন। রাজারামের নামে অনেকগুলি গান তানসেন রচনা করেছেন—তার কতকগুলি আমি জানি। রেওয়ায় কয়েক বৎসর বাসের পর তানসেনের সৌভাগ্যরবি অকস্মাৎ উদিত হ'ল। এই সময়েই আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন ও তাঁর সঙ্গে রেওয়া অধিপতি রাজারামের বিশেষ প্রীতি সংস্থাপিত হল। আকবর বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে একবার রেওয়ায় এসেছিলেন, ঐ সময় তানসেনের সঙ্গীতে আকবরের চিত্ত বশীভূত হয়ে পড়ল। রাজারাম তানসেনকে বাদশার নিকট উপহারস্বরূপ প্রদান করলেন—বাদশা সসম্মানে তানসেনকে দিল্লী দরবারে নিয়ে গেলেন। (১৫৫৬ খৃঃ অব্দ)।

আকবর বাদশাহকে মধ্যযুগের একজন যুগপ্রবর্ত্তক বললেও অত্যুক্তি হবে না। ধর্ম্মশাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কৃষ্টির এত বড় প্রেরণা রাজা বিক্রমাদিত্যের পর ভারতবর্ষে আর কেহ দেন

নাই। বাদশা আকবর বিক্রমাদিত্যেরই পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁর দরবারে এক নবরত্ন সভা স্থাপন করেন—তানসেন নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্নরূপে পরিচিত হলেন। তানসেন ভিন্ন তাঁর দরবারে আরো নিম্নলিখিত সঙ্গীত বিশারদ্ গুণীগণের নাম আমরা ইতিহাসে পাই:—মিঁয়া খোদাবকস, মিঁয়া মসনদ আলি খাঁ, বাবা রামদাস, রামদাসের পুত্র সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, নবাৎ খাঁ বীণকার, বাজ বাহাদুর, কেল পণ্ডী, তানসেনের পুত্র চতুষ্টয়—সুরৎসেন, শরৎসেন, তরঙ্গসেন, বিলাস খাঁ। ও তানসেনের শিষ্যদ্বয়—তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ। এঁদের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য তবে এঁরা ছাড়াও অসংখ্য গুণী দিল্লীদরবারে তখন প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

তানসেনের দরবার-জীবন সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমঐতিহাসিক জনশ্রুতি আমরা শুনতে পাই—সেগুলি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তানসেন দরবারের শ্রেষ্ঠতম গায়করূপে বাদ্‌শাহের অশেষ সম্মানাস্পদ তো ছিলেনই, তা ছাড়া আকবরের সর্ব্বোত্তম ও সব চেয়ে অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন। তানসেন ছাড়া আকবরের জীবন নীরস মরুভূমি সদৃশ—তানসেনই বাদশাহের শান্তি ও আনন্দের একমাত্র উৎস—তানসেনের সঙ্গীতই তাঁর জীবনের সারতম রসায়ন। তাই আকবর শাহ তানসেনকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারতেন না—নিশীথে শয়ন-মন্দিরে, অন্তঃপুরেও তানসেনের ছিল অবাধ গতি। প্রত্যহ শয়নকালে তানসেনের গানে বাদশার নয়ন নিমীলিত হ'ত ও প্রভাতে পাখীর কলকূজনের সঙ্গে সঙ্গে তানসেনের গান ছিল বাদশার প্রভাতী মঙ্গলআরতি। ভোরে ও রাত্রে তানসেনের গান ছিল বাঁধা, তা ছাড়া বাদশার অভিপ্রায়-মত অন্যান্য সময়েও গান গাইতে হ'ত। একদিন সিংহাসনোপবিষ্ট

বাদ্‌শার এমন জীবন্ত বর্ণনা তানসেন সঙ্গীতের ঝঙ্কারে মূর্ত্তিমান করে তুল্লেন, যে বাদ্‌শা সেদিন আপনার কণ্ঠস্থিত মণিহার খুলে তানসেনের কণ্ঠে পরিয়ে না দিয়ে পারলেন না। আর সেদিন থেকেই "তানসেন" পদবী হয়েছিল। বাদ্‌শার দত্ত নামের অর্থ এই যে—যিনি সঙ্গীতের "তানের" দ্বারা "সৈন" কর্ত্তে পারেন অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত কর্ত্তে পারেন, তিনিই তানসেন।

আকবর বাদশার সঙ্গীততৃষ্ণা ক্রমশঃ এতই বেড়ে গেল যে আপনার দরবারে বা বিশ্রামভবনে শুধু তানসেনের গান শুনে তাঁর তৃপ্তি হ'ত না।—অবশেষে গভীর রাত্রিতে তিনি ছদ্মবেশে তানসেনের আলয়ে তানসেনের মুক্ত হৃদয়ের বাঁধনহারা গান শুন্‌তে যেতেন। এক দিন এ ঘটনা তানসেন আবিষ্কার করে ফেল্লেন—সেদিনও আকবর তাঁকে ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের অপর একটি হার উপহার দান করেছিলেন।

এই সংবাদ রাষ্ট্র হ'বার পর অন্যান্য গুণীরা সবাই তানসেনের প্রতি দারুণ ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লেন ও তানসেনকে কি ক'রে লাঞ্ছিত করা যায় তার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হ'ল। তানসেন ছিলেন দিলদরিয়া লোক, ধনরত্নের মর্য্যাদা তাঁর কাছে ছিল না—খোস্‌ খেয়ালে তিনি চল্‌তেন, বাদ্‌শার দেওয়া সেই হারটী হঠাৎ তিনি বেচে ফেল্লেন। এই সংবাদ অন্যান্য গুণীরা বাদশার কানে তুল্লেন। বাদ্‌শার দেওয়া উপহার বিক্রয় করে ফেলাতো সামান্য কথা নয়? বাদশা রাগান্বিত হ'য়ে পরদিন তানসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার সে হার কোথায়? তুমি যখন আমার দরবারে এস তখন একদিনও সে হার তোমার গলায় দেখতে পাইনা কেন? কাল যখন দরবারে আস্‌বে তখন সে হার প'রে আসা চাই।" বাদশার এই কঠোর আজ্ঞায় তানসেন অধোবদনে বল্লেন "জাঁহাপানা! সে হার আমি খুইয়েছি। এ কথা শুনে বাদশা ক্রুদ্ধস্বরে

বল্লেন "যদি তুমি হার না নিয়ে আস্‌তে পার তবে নিশ্চয় জেনো এ দরবারে আর তোমার স্থান নেই।"

তানসেন অতি লজ্জিত হ'য়ে ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর ভাবনা হ'ল এখন উপায় কি? কোথায় যাই—কোথায় গেলে এ হার অপেক্ষাও মূল্যবান হার পাওয়া যায়—কেই বা দিবে—আর কারই বা এরূপ দানের সামর্থ্য আছে। অনেক ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর পূর্ব্ব মনিব রাজারামের কথা মনে পড়ল।

তাঁর মনে হ'ল গুণী প্রতিপালক করুণানিধান রেবাধিপতি রাজারাম তাঁর প্রতি পূর্ব্বের প্রীতি আজও নিশ্চয়ই হারাননি। সেই দিনই তানসেন নিশাযোগে রেবায় যাত্রা কর্‌লেন। রেবায় পৌঁছে রাজারামের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁকে বল্লেন, "মহারাজ! অনেক দিন আপনাকে কিছু শুনাতে পারিনি এজন্য আজ কিছু শুনাতে এসেছি। রাজারামকে শোনাবার জন্য এসময় দুটি ধ্রুপদ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। একটি হচ্ছে শুক্লবেলাবলের "রাজারাম নিরঞ্জন," অপরটি মেঘ রাগের "মগন রহো রে"।

গান দুটিতে রাজারাম মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ আপনার পা থেকে রত্ন-ময় পাদুকা দু'টি খুলে তানসেনকে দিলেন। পাদুকা যুগলের মূল্য ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

এই পারিতোষিক লাভ ক'রে তানসেন রেবা থেকে পুনরায় দিল্লী যাত্রা কর্‌লেন। বিদায়ের সময় রাজারাম যখন তানসেনকে দু'বাহু প্রসারিত ক'রে গাঢ় আলিঙ্গন কর্‌লেন তখন তানসেন ভক্তি গদগদ কণ্ঠে তাঁকে বলেছিলেন "মহারাজ! আজথেকে আমার দক্ষিণ হাত আপনার। আর কাহারও অভিবাদনের জন্য এ হাত উত্থিত হ'বে না।"

তানসেন দিল্লী ফিরে এসে বাদশার দরবারে গিয়েই আকবরকে

কুর্ণিস করলেন। বাদশার মন তখন নরম হ'য়ে গিয়েছিল। আকবর তাঁ'কে রহস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা তা তো হ'ল, কিন্তু আমার জন্য কি এনেছ!" তখন তানসেন কাপড়ের মধ্যে থেকে সেই পাদুকাদ্বয় বের করে বাদশার সামনে দিলেন ও বল্লেন "আপনার ১৮ লক্ষ টাকার হারের মূল্য শোধ হ'লে বাকি আমাকে ফেরৎ দিতে আজ্ঞা হয়।" আকবর যুগপৎ বিস্ময়ে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে মাথা নত কর্লে'ন তখন তানসেন বল্লেন "এই রত্নপাদুকা সাতস্বরের মধ্যে একটি স্বরের ও তুল্য নয়।"

আকবর বাদশা একদিন মিঁয়া তানসেনকে বলেছিলেন "তোমার গানই যখন এত মিষ্টি, না জানি তোমার গুরুদেবের গান বা আরও কত মিষ্টি। তোমার গুরুদেবের গান আমাকে শোনাতে হবে." তানসেন বল্লেন "আমার গুরুদেব যোগীপুরুষ, বনে বাস করেন, তিনি তো আপনার সভায় আসবেন না। তবে যদি তাঁর গান শোনার ইচ্ছা থাকে তবে সেখানে আপনাকেই যেতে হ'বে।" বাদসা তাই শুনে তানসেনের ভৃত্যের সাজ পরে গোপনে স্বামিজীর জন্য বহুমূল্য রত্ন পারিতোষিক স্বরূপ নিয়ে তানসেনের সঙ্গে স্বামীজীর কাছে গেলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী তিনি উভয়কে দেখ্‌বামাত্র তানসেনকে সম্বোধন করে বল্লেন—"আরে তন্নুয়া! বাদশাকে এত্তা তক্‌লিফ দেকর কাঁহে সাথ্‌মে লেয়ায়া!' বিস্ময়াভিভূত তানসেন স্বামীজি'কে বাদসার আসার উদ্দেশ্য নিবেদন কর্লে'ন। স্বামীজী সম্মত হলেন এবং আনন্দিতচিত্তে বাদশাকে গান শোনালেন। স্বামীজীর গানে যেন রাগরাগিণীরা মূর্ত্তি ধ'রে ধরাতলে অবতীর্ণ হ'লেন। বাদশা আত্মহারা হ'রে ধনরত্ন সব স্বামীজীকে দিতে গেলেন। স্বামী হরিদাস তখন ঈষৎ হাস্যস্ফুরিত অধরে বল্লেন "হম ফকীর হুঁ—রত্নসে হামারা ক্যেয়া কাম্, যব রত্নহি দেনে মাঙ্গো তো

হিয়ে গাও আঁখ বন্দ ক'রকে শুনো যব্ রতন্‌কা দরকার দেখোগে লাগায়ে দেনা।" এই কথা বলে হরিদাস একটি গান গাইলেন, গানের প্রভাবে আকবর ধ্যাননিমগ্ন হ'য়ে যেন এক অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগ্‌লেন—গান বন্ধ হবারও কিছুক্ষণের মধ্যে সে ধ্যান ভাঙে নি। অবশেষে যখন বাহিরে দৃষ্টি ফিরল তখন স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন—"কুছ দেখা"? বাদ্‌শা বল্লেন "যমুনাজীমে এক রতন্‌কা ঘাট বানা হ্যায়, পানি ভরতে হ্যাঁয়, উঠাতে হ্যাঁয় ঔর ঐ ঘাটকা এক সিঁড়িমে এক জাগা টুটা হ্যাঁয় কৈ গির যায় ইস্‌ওয়াস্তে কিসন্‌জী হুঁয়াই খাড়া হোকে খবরদারি করতে হ্যাঁয়।" স্বামীজী বল্লেন "ঠিক হায়, আপ হামকো যো রতন দেনে মাঙ্গা ঐ রতনসে টুটা সিঁড়ি কো বানায় দেও।" তখন বাদ্‌শা বুঝলেন স্বামীজী যা চেয়েছেন তা পূরণ করা বাদশার কর্ম্ম নয়; অবশেষে অনেক অনুরোধের পর স্বামীজী বল্লেন "আমি নিজে তো কিছু নিব না; কেলীতরে পাখীদের জন্য কিছু অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করে দিলে তাতেই আমি সুখী হব।" আকবর এই অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিঁয়া তানসেন ভৈরব রাগে সিদ্ধ ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে নায়ক গোপালের বংশসম্ভূত কোনও স্ত্রীলোক তাঁকে ভৈরব-রাগ শিখিয়েছিলেন। এই রাগ তিনি দরবারে গাইতেন না; শুধু শাহ্ আকবরের নিদ্রাভঙ্গের সময় অন্দরে এই রাগ আলাপ কর্ত্তেন। দরবারের কতকগুলি রাগ তিনি বেশী গাইতেন; সেগুলী 'দরবারী' রাগ নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে দরবারী কানাড়া আজও রাগ বিভাগে অতি উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছে। তানসেন কানাড়া এত বেশী ভাল গাইতেন যে বাদ্‌শা কানাড়াকে মিঁয়া কি রাগ অর্থাৎ তানসেনের রাগ বল্‌তেন। এ রাগ তিনি অন্য কোনও ওস্তাদের কাছে শুন্‌তে চাইতেন না।

তানসেন দরবারী কাণাড়া ছাড়াও আরো কতকগুলি রাগে নিজ ব্যক্তিত্বের এমন প্রভাব রেখে দিয়ে গেছেন যা কখনও নষ্ট হবার নয়। উদাহরণ স্বরূপ দরবারী তোড়ি, মিঁয়া কি মল্লার, মিঁয়া কি সারঙ প্রভৃতির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এ সবগুলিই "দরবারী রাগ" বা "মিঁয়া কি রাগ"। এ সব রাগরাগিণী, তানসেন ও তাঁর বংশাবলীর নিকট হ'তে এক বিশেষ রূপ এ ছন্দ পেয়ে আজও সঙ্গীত জগতে অপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চার করছে।

তানসেনের সৌভাগ্য বাদশার প্রীতি অভিষেকে পুষ্পিত ও ফলিত হ'তে দেখে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ওস্তাদদের ঈর্ষ্যার আর অন্ত ছিল না। তাঁরা যুক্তি ক'রে তানসেনের জীবন নাশের এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তাঁরা বাদশাকে গিয়ে বল্লেন, "জাঁহাপনা! আমরা দীপক রাগ কখনও শুনি নি, আপনার অনুগ্রহে দীপক রাগ শুনে শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ কর্ত্তে চাই। মিঁয়া তানসেন ভিন্ন আর কেহ এ রাগ জানেন না।" বাদশা তাদের অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পারেন নি। তিনি সহজবুদ্ধিতে তানসেনকে বল্লেন "মিঁয়া! দীপক রাগ আমি কখনও শুনি নি। আমায় তুমি শোনাও" তানসেন বল্লেন যে দীপক রাগ গাইলে তিনি মারা পড়্‌বেন। কিন্তু কৌতুহলাক্রান্ত বাদশা কিছুতেই ছাড়লেন না। অগত্যা, তানসেন অনেক ভেবে পোনর দিন সময় চাইলেন।

তানসেন তাঁর সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে তার প্রতিরোধার্থ এক উপায় বের করলেন। দীপকরাগের তেজ মর্ত্ত্য-গায়ক সহ্য কর্ত্তে পারে না—সুরের আগুনে শরীর পর্য্যন্ত জলে যায়। তার প্রতিকার হ'তে পারে কেহ যদি সঙ্গে সঙ্গে সুরের শীতল ধারাসারে সে আগুন নিভাতে পারে। সুরব্রহ্মে তেজস্তত্ব যেরূপ আছে, অপও তেমি রয়েছে; রাগভেদে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রকাশ পায়। দীপকের তেজে যেমন

আগুনের সৃষ্টি হয়, মেঘরাগের দ্বারায় তেমনি বিপুল বারিধারা বর্ষিত হয়ে থাকে। তাই তানসেনের কণ্ঠে দীপক রাগ যখন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তখনই যদি কোনও সঙ্গীতসাধক মেঘরাগকে আবাহন কর্ত্তে পারেন তা হ'লেই তানসেনের জীবন রক্ষা পেতে পারে।

এই ভেবে তানসেন পোনরদিন ধ'রে তাঁর গুণবতী সরস্বতী ও স্বামী হরিদাসের শিষ্যা রূপবতীকে মেঘরাগ শিক্ষা দিলেন। বাদশাকেও স্বীকৃতি জানালেন যে দীপক রাগ তিনি গাইবেন।

তানসেন দীপকরাগ গাইবেন এই সংবাদ জন হ'তে জনান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে দেখ্‌তে দেখতে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। এক পক্ষ ধ'রে হাজার হাজার লোক দিল্লীনগরে সমবেত হ'তে লাগলো। বাদশা সেই জনমণ্ডলীর সংস্থানোপযোগী এক বিপুল অঙ্গনে সভার আয়োজন কর্লেন। তানসেন দীপকরাগ গাইবেন, না জানি কি এক অলৌকিক ঘটনা ঘটবে, এই ভেবে বহু মিত্র ও সামন্ত রাজা আকবরের আতিথ্য গ্রহণ কর্লেন।

একপক্ষ পূর্ণ হ'লে তানসেন দরবারে উপস্থিত হলেন। সভায় লোকে লোকারণ্য—রাজা, উজীর, সভাসদ, সৈন্যদল ও অসংখ্য প্রজামণ্ডলী সভার চতুর্দ্দিক ঘিরে সমাসীন। প্রভাতে সভায় তানসেন দীপকরাগের যজ্ঞ আরম্ভ কর্লেন। ওদিকে তানসেনের আদেশানুযায়ী সরস্বতী ও রূপবতী প্রভাত হ'তেই আপন গৃহে মেঘরাগের যজ্ঞ আরম্ভ করে'ছলেন। তানসেনের উপদেশ ছিল, যে তিনি দীপকরাগের অর্চ্চনা শেষ ক'রে দীপকরাগ যখনি গাইতে আরম্ভ করবেন, সেই সঙ্গে তাঁরাও মেঘরাগের পূজা সমাপনান্তে মেঘের আলাপ সুরু করবেন। যাতে মুহূর্ত্তের ত্রুটিতেও কোনও বিপদপাত না হয়, সেজন্য আগেই সময়ের সঙ্কেত দেওয়া ছিল। উপযুক্ত সঙ্গীত সাধিকাদ্বয়ের উপরে এ

গুরুভার দিয়ে তানসেন অনেকটা নিশ্চিন্তচিত্তেই সভায় এসেছিলেন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় গান সুরু হবে এরূপ পূর্ব্ব হ'তেই স্থির ছিল। যথাসময়ে যজ্ঞ ও পূজা শেষ হ'লে বাদ্‌শা সভায় আগমন কর্লেন। তানসেন বাদ্‌শার অনুমতি নিয়ে দীপকরাগ আরম্ভ কর্লেন। সভার চতুর্দ্দিকে বহু প্রদীপ দেওয়া ছিল—তানসেন বাদশার কাছে থেকে এই অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন—যে প্রদীপগুলি জ্বলে ওঠামাত্র গান তিনি বন্ধ করবেন। প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গে সভাপ্রাঙ্গনে সকলেরই বোধ হল যে দারুণ গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়েছে। তানসেনও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হ'লেন। তারপর দ্বিতীয় গীতান্তে তানসেনের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তৃতীয় গীতে গাত্রদাহ ও চতুর্থ গীতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ সব জ্বলে উঠল—সভায় দাউ দাউ ক'রে আগুন লেগে গেল।

তখন রাজা বাদ্‌শা ওমরাও প্রজাগণ যেদিকে পার্‌লেন সভা ছেড়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হ'লেন্। সবাই আপন প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত। এই অবসরে অর্দ্ধদগ্ধপ্রায় তানসেন সভা ছেড়ে নিজ গৃহে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলেন। দিল্লীনগরে মহা হুলুস্থূল প'ড়ে গেল।

এদিকে ঘরে তানসেন-দুহিতা সরস্বতী ও সাধিকা রূপবতী মেঘ-রাগের পূজান্তে রাগালাপ সুরু ক'রে ছিলেন। অর্দ্ধদগ্ধপ্রায় তানসেনকে দেখে রূপবতী মেঘের একটি গান গাইলেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে, সূর্য্যদেবকে আবৃত ক'রে ফেল্ল—দিল্লীনগর আঁধারে ঢেকে গেল। সন্ সন্ শব্দে প্রবল বাতাস দিগ্মণ্ডল ব্যস্ত ক'রে তুল্ল—বিজলীর চমকে ও বজ্রের গম্ভীর গর্জ্জনে এক আকস্মিক ঝটিকার সূচনা হ'য়ে উঠল। এই সময় সরস্বতী মেঘের দ্বিতীয় গান গাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘোর ঘনঘটা আকাশ ছাপিয়ে বারিধারার ধরাতল

অতিষিক্ত কর্ত্তে লাগল। সেই বর্ষাসারে তানসেনের দগ্ধ অঙ্গ শীতল হ'ল।

পাঠকগণ এই ঘটনাকে রূপকথা মনে করবেন না—এই ঘটনা ঐতিহাসিক ও ইহার সত্যতার বহু প্রমাণ আজো পাওয়া যায়। জড় প্রকৃতির উপরেও সঙ্গীতের প্রভাব যে কতখানি তা এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি।

দীপকরাগ গাইবার পর তানসেনের শরীর সাময়িক একেবারে অপটু হ'য়ে পড়েছিল, মাসখানেক তাঁকে প্রায় শয্যাগত অবস্থায়ই কাটাতে হয়েছিল। বস্তুতঃ সরস্বতী ও রূপবতী সঙ্গীতবলে মেঘরাগ আবাহন ক'রে না আন্‌তে পারলে তানসেনকে সেদিনই ইহলীলা সাঙ্গ কর্ত্তে হ'ত। তানসেন তাই দীপকরাগ কখনও বেশী গাইতেন না। তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এই রাগ অধিক অভ্যাস নিষিদ্ধ, তবে অন্যান্য রাগ শিক্ষার পর এই রাগ তাঁদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা আজও আছে। আমরা তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট এই রাগের আলাপ ও দুই তিনটি ধ্রুপদ শুনেছি। অনেকের বিশ্বাস, দীপকরাগ ভারতবর্ষ থেকে লোপ পেয়ে গেছে—কথাটা সত্য নয়।

সঙ্গীতের প্রভাবে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের কথা শুনলে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বলবেন এ সব গাঁজাখুরি কথা। মনোবল কি ভাবে জড় প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তে পারে, সে তত্ত্ব বিশ্লেষণের স্থান এ নয়—তবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে ইহা প্রমাণিত করা যে দুরূহ নয়, তা যে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের পাতঞ্জল বা তন্ত্রশাস্ত্রে চোখ বুলিয়েছেন, তিনিই জান্‌তে পেরেছেন। পাশ্চাত্য মনীষিরাও আজ অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্বন্ধে এতটা প্রমাণ সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক জগতে

অনেক অলৌকিক্ সত্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, যে আজকের দিনে তাই এ সব কথাকে কল্পনা বলে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সত্য কথা বল্‌তে হ'লে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা কর্ত্তে গিয়ে অতি লৌকিক ঘটনার বাহুল্য বাদ দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবে যাঁরা বিশ্বাস করেন না তাঁদের উপর জোর করা যেমন চলে না, তেমি যাঁরা অতীন্দ্রিয় শক্তির কার্য্যকারিতায় আস্থাবান্ তাঁদের বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকারও কারুর নেই, এটা বল্‌তে পারি।

দীপকরাগে অগ্নিদাহের ঘটনা ছাড়া অন্য রাগের প্রভাবেও দাবদাহের উল্লেখ আমরা তানসেনের জীবন-ইতিহাসে পাই। সঙ্গীতাচার্য্য ও দর্শন বিশারদ পণ্ডিত সুদর্শন শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গীতগ্রন্থে লিখেছেন "শ্রীহরিদাস স্বামীজীনে আক্‌বরকো লঙ্কা দহন সারং শুনাই তো বন্‌মে অগ্নি লগ গই অক্‌বর বহুৎ ডরে, তব স্বামীজীনে তানসেনজীকো মেঘরাগ গানে কহা। ইন্‌কে মেঘরাগ সে বর্ষা হুই জিসসে উহ অগ্নি শান্ত হোগই।" স্বামী হরিদাস লঙ্কাদহন রাগ গেয়ে বনে আগুন জালিয়েছিলেন, পরে তানসেনের মেঘরাগে বর্ষা হওয়ায় সে দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। বাদশা আক্‌বর সেখানে ছিলেন বলেই এই ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ কর্‌তে পার্‌লাম। সঙ্গীতের অলোকশক্তির অপর একটি দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় জান্‌তে পাই।

Y. M. C. A. র বিশিষ্ট পদাধিকারী সুবিদ্বান্ ও হিন্দু সঙ্গীত-প্রেমিক Rev. H. A. Popley তাঁর "The Music of India" নামক গ্রন্থে লিখেছেন :—

Once the celebrated Tansen was ordered by the Emperor to sing a night Raga at noon. As he sang, darkness came down on the place where he stood and

spread around as far as the sound reached" অর্থাৎ একদা বাদশা আকবর দ্বিপ্রহরের সময় মিঁয়া তানসেনকে কোনও নৈশ-রাগ গাইতে বলেছিলেন। তানসেন সে রাগ গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারিদিকে আঁধার ঘিরে এল ও যতদূর তাঁর কণ্ঠস্বর বিস্তৃত হচ্ছিল আঁধারও ততদূর ছড়িয়ে পড়েছিল।

তানসেনের জীবন বহু অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সঙ্গীত প্রভাবে তিনি বাদশার পরিবারের অনেকের কঠিন ব্যাধি অনেকবার সারিয়েছিন। তানসেন এ সব বিভুতির জন্য মোটেই অহঙ্কার কর্ত্তেন না। তিনি কোনও যাদু জানতেন না, তিনি বলতেন যে পরমেশ্বরের সঙ্গে সংযোগে যখন যুক্তাবস্থায় গান গাওয়া যায় তখনই এ সব অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়। এ সবের উপর তাঁর নিজের কোনও হাত ছিল না, সবই দৈবপ্রভাবে ঘটত। এই দৈবশক্তি-সিদ্ধ ফকীর মহম্মদ গওসের আশীর্ব্বাদের ফল ও স্বামী হরিদাসের প্রদত্ত যোগদীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়া সে আর কিছুই নয় তা' তানসেন বিশ্বাস কর্ত্তেন।

দীপকরাগ গাইবার ফলে যখন তানসেনের কিছুদিন শারীরিক অপটুত্ব এসেছিল, তখন আকবর তানসেনের সঙ্গ না পেয়ে অন্যমনস্ক হবার জন্য মৃগয়ায় মন দিয়েছিলেন। এই সময় আর একটি দৈবসংযোগ উপস্থিত হয় যা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়।

আকবর মৃগয়ার্থ সিন্ধুদেশে গিয়েছিলেন। কিছুদিন মৃগয়ারপর একদা বাদশা সারাদিন শীকারের সন্ধানে অরণ্যে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁবু বহুদূরে, এদিকে সঙ্গের জলও ফুরিয়েগিয়েছিল, তৃষ্ণায় তিনি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লেন ; এ অবস্থায় নিকটে কোনও জলাশয় আছে কিনা দেখবার জন্য অনুচরেরা খুঁজতে বেরুল। কিছুদূর যাবার পর তারা হঠাৎ একটি উদ্যান ও দীঘি দেখতে পেল। উদ্যানে

একজন উদ্যানরক্ষক ছিল, সে তাদের প্রশ্ন কর্ল তারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে তথায় এসেছে, তারা বল্ল, বাদশা আক্‌বর মৃগয়ায় এসে পথি-মধ্যে তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে পড়েছেন তাই জলের সন্ধানে তারা এসেছে। উদ্যানরক্ষক তখন তাদের যথেচ্ছ জল নিতে অনুমতি দিল। দীর্ঘিকায় উপনীত হ'য়ে তারা দেখতে পেল দীর্ঘিকার অপর প্রান্তে একটি বৃহৎ শিব-মন্দির অবস্থিত। মন্দির দ্বারে একটি বীণাযন্ত্র রেখে জনৈক সাধু পূজায় রত। তারা এটা লক্ষ্য কর্ল মাত্র কিন্তু উদ্যানরক্ষককে কিছু জিজ্ঞাসা কর্ল না। পানীয় পাত্রে প্রচুর জল নিয়ে অবশেষে বাদশার নিকটে গিয়ে সমুদয় বিবরণ নিবেদন কর্ল। বাদশা তৃষ্ণা নিবৃত্তির পর কৌতুহলাক্রান্ত হ'য়ে সেই শিব-মন্দিরে তখনই চ'লে এলেন। মন্দিরে উপনীত হ'য়ে দেখলেন রক্তাম্বরধারী রক্তচন্দন-চর্চ্চিত, প্রসন্ন-দর্শন দীর্ঘাকৃতি জনৈক বীর-তান্ত্রিক সদ্য পূজা সমাপনান্তে বীণা-যন্ত্রটির সুর মেলাচ্ছেন। বাদশা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁকে প্রণাম ক'রে আত্মপরিচয় দিলেন ও তাঁর যন্ত্র শুনতে চাইলেন। তান্ত্রিক সহাস্যে বীণা স্কন্ধে নিয়ে পূরবীর আলাপ সুরু কর্লেন।

বীণার প্রথম ঝঙ্কারেই বাদশা চমকে গেলেন। এরূপ বীণা তিনি জীবনে আর কখনও শোনেন নি। তানসেনের গান শুনে শুনে, আর কারু গান শুনতেই বাদশার ইচ্ছা হ'ত না, কোনও তন্ত্রাকারের বাজনা শোনাতে দূরের কথা। কিন্তু এ বীণা শুনে বাদশার ভ্রম হ'ল যে, তানসেনের কণ্ঠ যেন কেউ কেটে বীণার সোয়ারিতে বসিয়ে দিয়েছে— যন্ত্র-সঙ্গীত যে এতদূর উৎকর্ষ লাভ কর্ত্তে পারে, তা বাদ্‌শার ধারণার অতীত ছিল। যন্ত্রালাপ সাঙ্গ হবার পর, বাদ্‌শা সেই যোগীপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথমটা তিনি পরিচয় দিতে চাইলেন না, পরে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বল্লেন, যে তাঁর নাম মিশ্রী সিং,

তিনি আজমীড় সিংহগড়ের ক্ষত্রিয়-নরেশ মহারাজ সমুখন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর পিতা এই বাদশারই সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত, হৃতরাজ্য ও নিহত হবার পর তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে অরণ্যে চ'লে এসেছেন—তাঁর সংসারে আর কেহই নাই—শুধু এই বীণাই তাঁর সম্বল—ক্ষত্রিকুলে তাঁর জন্ম, অরণ্যে তন্ত্রসাধনা ও বীণাবাদনে তিনি কালযাপন ক'রে থাকেন।

এত বড় গুণী রাজার রাজ্য বাদশারই দিগ্বিজয়ের ফলে ছারখার হ'য়ে গেছে একথা জান্‌তে পেরে আকবর বাদশা লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মিশ্রীসিংজী বল্লেন যে, রাজৈশ্বর্য্যের কথা ভুলেও তাঁর মনে হয় না, অরণ্যে মহাশান্তিতে তিনি রয়েছেন। বাদশা তাঁকে দিল্লী নিয়ে যেতে চাইলেন। তাঁকে বল্লেন, যে রাজ্য তাঁর গিয়েছে বটে কিন্তু তিনি বাদশার দরবারে অতি সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন—মিয়া তানসেনের সহযোগীরূপে তিনি বাদশার দরবারে স্থান পাবেন। মিশ্রীসিংজী সন্ন্যাসী ছিলেন না—যোগী ছিলেন, তাই সংসার ত্যাগই তাঁর একমাত্র ধর্ম্ম ছিল না। তবে নির্জন অরণ্যের শান্তিপূর্ণ আশ্রয় ছেড়ে কোলাহলপূর্ণ রাজদরবারে যেতে তাঁর মন সর্‌ছিল না। কিন্তু প্রবল প্রতাপ বাদশার ঐকান্তিক আগ্রহ লঙ্ঘন কর্ত্তে তাঁর ভরসা হ'ল না—বাদশার সঙ্গে তিনি দিল্লী গেলেন। তথায় মাসিক দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তাঁর বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'ল। মিশ্রীসিংজীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যে আমরা অনুরূপ বিবরণ পাই, তা নিয়ে লিখিত হ'ল।

সম্রাট্ আক্‌বরের দরবারে তানসেন কণ্ঠসঙ্গীতের কোহিনুর ছিলেন সত্য কিন্তু এমন কোনও যন্ত্রী তথায় ছিলেন না যিনি বাদশার মনোরঞ্জন কর্ত্তে পার্ত্তেন। যন্ত্র-সঙ্গীতের এ অভাব ও অপকর্ষ বাদশা খুবই অনুভব কর্ত্তেন। একদিন তিনি তানসেনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,

ভারতবর্ষে এমন কোনও যন্ত্রী আছেন কিনা যাঁর বাজনা শুনে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে। তানসেন বল্লেন, কোনও পেশাদার ওস্তাদের সাধ্য নাই যে বাজিয়ে বাদশাকে খুসী কর্ত্তে পারেন তবে একজন রাজা আছেন, তাঁকে যদি বাদশা নিমন্ত্রণ করেন তবে তাঁর বীণার শুনে বাদশা সত্যি আনন্দ পাবেন, তাঁর বীণার তুলনা নাই। তিনি হচ্ছেন সিংহল-গড়াধিপতি রাজপুত মহারাজ সমুখন সিং। তানসেনের কাছে এ সংবাদ পেয়ে বাদশা মহারাজ সমুখন সিংহকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। মহারাজকে জানান হ'ল যে তাঁর বীণার সুখ্যাতি শুনে বাদশা পরম আগ্রহান্বিত ও তাঁর বীণা শোনবার জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত, সুতরাং মহ রাজকে অনুগ্রহ ক'রে দিল্লীতে পদধূলি দিতে হবে।

বাদশা আকবরের নীতিই ছিল প্রতিবেশী রাজন্যবৃন্দের সহিত প্রণয়বন্ধন স্থাপিত করা—তাতে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যও সফল হ'ত। তিনি অনেক হিন্দু নৃপতির সহিত শোণিত-সম্পর্ক সংস্থাপন করে উত্তর ভারতে কি করে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার কর্ত্তে পেরেছিলেন. তা ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন। এ ক্ষেত্রে আকবর ভাবলেন, মহারাজ সমুখন সিংহের সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধ স্থাপনার ফলে সিংহলগড়রাজ্যটিকেও মিত্ররাজ্যে পরিণত করা যাবে। বীণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এটা হবে বাদশার ডবল লাভ।

মহারাজ সমুখন সিং মোগল সম্রাটের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভালরূপই জান্‌তেন—তেজস্বী রাজপুতরাজা মোগল সম্পর্ক অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন। যবনের সঙ্গে মৈত্রী অপেক্ষা বিরোধই তিনি পছন্দ কর্‌লেন—যদিও তিনি জান্‌তেন যে এ বিরোধের ফল সর্ব্বনাশ। এই সর্ব্বনাশকেও চিতোর রাজ্যের ন্যায় তিনি গৌরবময় ভাবলেন। তিনি বাদশাকে বলে পাঠালেন যে তিনি শিবমন্দিরে পূজাসনে ব'সে মহাদেবকে

যে যন্ত্র শোনান, যবনরাজের শ্রুতিগোচর হ'তে পারে না! বাদশা ইচ্ছা করলে তাঁর রাজ্য লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বীণা তিনি শুনতে পারেন না।।

মহারাজের এই প্রত্যাখ্যানে বাদশার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হ'ল। তিনি সদলবলে যুদ্ধযাত্রা করে সমুখন সিংকে বধ করলেন এবং যুবরাজ মিশ্রী সিংকে বন্দী করলেন। বীণা বাদনে যুবরাজ মিশ্রী সিংও পিতার তুল্যই ছিলেন। তিনি গোপনে যখন বন্দীশালায় বীণা বাদনে রত ছিলেন তখন তাঁর বীণা বাদনের দক্ষতা দেখে বাদশা তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং দিল্লী দরবারে আহ্বান করলেন। কিন্তু মিশ্রী সিংজী তাতে সম্মত হন নাই। বাদশা তখন তানসেনকে তাঁর নিকটে ডেকে আনলেন। তানসেন মিশ্রী সিংকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর ক্ষোভ দূর করে তাঁকে দিল্লী দরবারে বীণালাপ করতে সম্মত করালেন। ফলে মিশ্রীসিংজী দিল্লী দরবারে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হলেন। শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত এবং স্বাধীন নৃপতির পুত্র বলে তিনি সম্মান ত পেতেনই—তা বাদে, ভারতের শ্রেষ্ঠতম বীণাবাদক ব'লেও একটা বিশিষ্ট সম্মানও তাঁকে দেওয়া হ'ল। দরবারের গুণীমণ্ডলী একবাক্যে তাঁকে যন্ত্র সঙ্গীতের তানসেন বলে মেনে নিলেন ও মিঁয়া তানসেনও তাঁকে বাদসাহের সঙ্গীত-সভার একজন প্রধান গুণী ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন। মিশ্র সিংজীর ভূয়সী প্রশংসা দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল। তখনকার দিনে সঙ্গীত ছিল এক পূর্ণ সঙ্গতি বিশিষ্ট জিনিষ। গীত বাদ্য ও নৃত্য এ সকলের সঙ্গতিকেই সঙ্গীত বলা হয়। গান, মৃদঙ্গ, বীণা ও নটনটীর নৃত্য এ সকলের সমাবেশে সঙ্গীত তখন পেত এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য (harmony) যা এখন আমরা কল্পনাও কর্ত্তে পারি না। তানসেনের সঙ্গে সঙ্গতির উপযুক্ত বীণাবাদক হলেন মিশ্রী

সিং। যে সঙ্গতির অভাব এতদিন বাদশার দরবারে ছিল, মিশ্রী সিংজীর আবির্ভাবে তা দূর হ'ল। তানসেনের গানের সঙ্গে সঙ্গে অতঃপর সর্ব্বদা মিশ্রী সিংএর বীণা বাজত। তানসেন ধ্রুপদ রচনা ক'রে ঠিক্ যেমন ভাবে গাইতেন, মিশ্রী সিং তদনুরূপ গীত বীণায় বাজিয়ে দিতেন। এইরূপে কিছুকাল বাদশাহের সঙ্গীত সভায় এক অপূর্ব্ব সঙ্গত চ'ল্ল।

কিন্তু সঙ্গতের মধ্যে অসঙ্গতির সূত্রপাত হল কিছুদিন পর। ক্রমশঃ গুণের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে দ্বন্দ্বের ও প্রতিযোগীতার বৃত্তি উভয়ের মধ্যেই দেখা দিল—বিরোধ এল ঘনিয়ে। অবশেষে একদিন তানসেন ইচ্ছা করেই এমন এক তানযুক্ত গীত রচনা কর্লেন যা বীণায় বাজানো চলে না। হাজার হ'লে ও বীণার সুরের বাঁধন রয়েছ পর্দ্দায় পর্দ্দায়, আর গায়কের কণ্ঠ মুক্তবিহঙ্গের ন্যায় গতিশীল-গলার তান যন্ত্রে কতদূর উঠ্‌বে! ফলে সেই গান মিশ্রী সিংজী বাজাতে পার্লেন না। তিনি অবমানিত বোধ কর্লেন, বুঝলেন যে তাঁকে জব্দ করবার জন্যই তানসেন ঐরূপ গীত রচনা করেছেন। তিনি তানসেনকে তাঁর মনোভাব জিজ্ঞাসা কর্লেন ও বল্লেন. যে ঐরূপ আচরণ সঙ্গীতে সাধুতার পরিচায়ক নয়। তানসেনও তার রূঢ় জবাব দিলেন। মিশ্রী সিং ছিলেন খড়গধারী শক্তি ক্ষত্রিয়. তিনি ক্রোধ সম্বরণ কর্ত্তে পার্লেন না—কক্ষস্থিত খড়গ নিষ্কাশিত ক'রে তানসেনের শিরোদেশে, আঘাত করলেন তানসেনের কপাল দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। অতঃপর যখন মিশ্রী সিংজীর বিচারশক্তি ফিরে এল তিনি বুঝলেন যে কাজটা অতীব গর্হিত হয়ে' গেছে, তখনই তিনি সেই তরবারি হস্তে দরবার ত্যাগ ক'র দিল্লী হ'তে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। তারপর বহুদিন তাঁর আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই আঘাত হ'তে আরোগ্য লাভ কর্ত্তে তানসেনের ছয়মাস সময় লেগেছিল। এদিকে মিশ্রী সিং পূর্ব্ববৎ অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ ক'রে কাল কাটাতে লাগলেন। তিন বৎসর অতীত হ'লে ঘটনাক্রমে আকবর বাদ্‌শাহের উজীর নবাব খাঁন খানার সঙ্গে মিশ্রী সিংহের সাক্ষাৎ হ'ল। উজীর তাঁকে অভয় দান ক'রে আপন বাটীতে নিয়ে এলেন, ও পরে বাদ্‌শাহকে বল্লেন, "মিশ্রী সিংকে পাওয়া গেছে এবং আমারই আশ্রয়ে তিনি আছেন। হুজুরের যদি আদেশ হয়, তবে তাঁকে দরবারে নিয়ে আসি"। বাদ্‌শাহ মিশ্রী সিংহের সংবাদ পেয়ে খুবই হৃষ্ট হলেন, কেননা তৎকালে ঐরূপ বীণাবাদক আর কেহ ছিল না—কিন্তু মিশ্রী সিং আইনতঃ দণ্ডার্হ তাই বাদ্‌শা উজীরকে এক কৌশল উদ্ভাবন কর্ত্তে বল্লেন তিনি বল্লেন "একথা প্রকাশ করার আবশ্যকতা নাই; কেননা তানসেন জানতে পার্লে তার (মিশ্রী সিংহের) নামে অভিযোগ আনবে। তা হ'লেই বাধ্য হ'য়ে, আইনের খাতিরে আমায় দণ্ড দিতে হবে। এখন এমন কোনও কৌশল উদ্ভাবন কর যাতে তানসেন তার উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করে।" বাদ্‌শার এই মন্তব্য শুনে উজীর তানসেন ও মিশ্রী সিংহের পুনর্ম্মিলনের উপায় চিন্তা ক'রে স্থির কর্লেন যে কোনও রূপে তানসেনকে তাঁর নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে উভয়ের মিলন ঘটাতে হ'বে।

এই স্থির ক'রে তিনি রাষ্ট্র ক'রে দিলেন. যে তাঁর বাড়ীতে এক সুযোগ্য স্ত্রীলোক বীণকার এসেছে। লোক পরম্পরায় তানসেনের কানেও এ খবর গেল। তিনি ব্যগ্র হ'য়ে তথা কথিত স্ত্রীলোক-বীণকারকে দরবারে আনবার জন্য বাদ্‌শার অনুমতি প্রার্থনা কর্লেন। উজীর তানসেনের সামনে বাদশাকে বল্লেন "সেই স্ত্রীলোকটি পর্দ্দানসীন, দরবারে সে কি ক'রে আসবে? তবে আপনারা অনুগ্রহ ক'রে যদি

আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেন, তবে তার বাজনা শোনাতে পারি।" একথায় সকলেই স্বীকৃত হ'লেন। দিন স্থির হ'ল; বাদশা তানসেন ও অন্যান্য গুণীগণ যথাসময়ে উজীরের গৃহে উপস্থিত হ'লেন। বীণাবাদন সুরু হ'ল। সকলেই একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলেন। তানসেন খানিক শুনেই বল্লেন, "এ স্ত্রীলোক নয়, এ আমার দুষমণ"। উজীর একথা শুনে বল্লেন "কখনো নয়। এ স্ত্রীলোক। তবে আপনি মিশ্রী সিংএর কসুর যদি মাপ্ করেন তবে পর্দ্দা তুলে দেখিয়ে দিই।" এই সময় বাদশা ব'লে উঠ্লেন, "তানসেন! তুমি মিশ্রী সিংএর জোরা কাউকে এনে দাও, এর গর্দ্দান আমি নিচ্ছি।" তখন তানসেন বল্লেন—"হুজুরেরই দিল্ যখন এইরূপ, তখন আমিই বা কেন অসন্তুষ্ট থাকব—আমিও মাপ্ কর্‌ছি।" তানসেন এই কথা বলার পর উজীর পর্দ্দা তুলে স্ত্রীবেশধারী মিশ্রী সিংজীকে বাহিরে আন্‌লেন ও তানসেনের সাথে তাঁর মিলন ঘটা'লেন। বাদশা আকবর তখন তানসেনকে বল্লেন. "এ মিলন পাকা হ'ল না, তোমার মেয়ের সঙ্গে এর বিবাহ দেও। তুমিও হিন্দু ছিলে, ইনিও হিন্দু—তুমিও গুণী, ইনিও গুণী। এঁর মত পাত্র আর কোথায় পাবে?"

বাদশার এই কথায় তানসেন সম্মত হলেন এবং গুণবতী কন্যা সরস্বতীকে মিশ্রী সিংহের হস্তে সমর্পণ কর্লেন। এই সময় থেকে মিশ্রী সিংএর নাম নবাৎ খাঁ রাখা হ'ল (মিশ্রী—নবাৎ. সিংহ—খাঁ) এইরূপে নবাৎ খাঁ বা মিশ্রী সিং তানসেনের নিকটতম আত্মীয়ের স্থান অধিকার কর্লেন। তানসেন চারি পুত্র, কন্যা ও জামাতাসহ সুখে প্রৌঢ়-জীবন যাপন কর্ত্তে লাগলেন।

মিশ্রী সিং মুসলমান নাম নিয়েও তানসেনেরই ন্যায় যোগ আরাধনা-দিতে বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু ও মুসলমানের

মধ্যে পার্থক্য এত উৎকট ছিলনা। তাই মুসলমান সংস্কার নিয়েও হিন্দুরা আপন সংস্কার ও ক্রিয়া কর্ম্ম ত্যাগ কর্তেন না। মিশ্রী সিংজী নবাৎ খাঁ হওয়ার পরও রক্তবস্ত্র, সিন্দূর ও খড়গ প্রভৃতি ধারণ কর্তেন। তিনি তান্ত্রিকমতে সাধনা কর্তেন, সর্ব্বদা খাণ্ডার বা খড়গ ব্যবহার কর্তেন ও তাঁর সঙ্গীতের বাণীও খাণ্ডার-বাণী ছিল। তাঁর বীণায় শক্তিপূর্ণ উদাত্ত খাণ্ডার-বাণী বাজ্‌ত।

মিশ্রীসিংজী সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সুদর্শনাচার্য শাস্ত্রী লিখেছেন:— "তানসেনজীকে জামাতা নবাৎখাঁজী (মিশ্রী সিংজী) বীণাবাদনমে শ্রীহরিদাস স্বামীজীকে শিষ্য থে। যে বীণামে বড়ে প্রধান রে শরীরমে বড়ে বলিষ্ঠ থে। একদিন বাদশাহ আকবরকো রাত্রিমে বীণা সুনা রহেথে ইতনেমে বায়ুকে ঝোঁকসে মোমবত্তি বুঝ গই ইন্‌হোনে এক এইসি ঠোক্ বজাই কি মোমবত্তী ফির জল্ উঠি। ইনকি বীণাকী ধ্বনি বহুৎ দূরতক্ সুনাই দেতীথী; নবাৎখাঁজী জাতি প্রথম হিন্দু থে পিছে বিবাহকি কারণ মুসলমান হুয়ে। নবাৎখাঁজী জামাতা হোনেকে কারণ তানসেনজীকে পুত্রতুল্য হী থে ইস্‌সে সম্ভব হ্যায় কি ইন্‌কো কুছ শিক্ষা তানসেনজীসে ভি প্রাপ্ত হুই, তো ভি য়ে প্রাধান্সে বীণামে শ্রীহরিদাস স্বামীজীকে শিষ্য থে বীণাকে অদ্বিতীয় ওস্তাদ হুয়ে। ইন্‌কো খাণ্ডারে গোত থে।" অর্থাৎ তানসেনজীর জামাতা নাবাৎখাঁ হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনি বীণায় বড় প্রবীণ ছিলেন আর ইহার দেহও বড় বলিষ্ঠ ছিল। একদিন নবাৎখাঁ বাদশা আকবরকে রাত্রিতে বীণা শুনাইতেছিলেন, এমন সময় বায়ুবেগে কক্ষস্থিত মোমবাতি নিভে গিয়েছিল এই সময় ইনি বীণায় এমন ঠোক্ বাজালেন যে মোমবাতি পুনরায় জলে উঠেছিল। ইঁহার বীণার ধ্বনি বহুদূর অবধি শোনা যেত। নবাৎখাঁ প্রথমে হিন্দু ছিলেন পরে তানসেনের জামাতা হয়ে

মুসলমান হন্। জামাতা হবার দরুণ তানসেনজীর পুত্রতুল্য ইনি ছিলেন এবং তদ্দরুণ তানসেনের কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন। তবে ইনি শ্রীহরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং প্রধানত; তাঁর কাছ থেকেই বীণা শিখেছিলেন। বীণায় ইনি অদ্বিতীয় ওস্তাদ ছিলেন। ইঁহার বাণীর নাম খাণ্ডার-বাণী ছিল

তানসেন-দুহিতা সরস্বতী দেবী সঙ্গীত প্রভাবে কিরূপে তাঁর পিতার জীবন রক্ষা করেছিলেন ইতিপূর্ব্বে আমরা তা লিখেছি। তানসেনের দুহিতার ন্যায় তাঁর চারি পুত্রও সঙ্গীত সাধনায় বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। তানসেনের বয়স যখন সপ্ততিবর্ষ উত্তীর্ণ হ'ল তখন তিনি তাঁর অন্তিম সময় নিকটবর্ত্তী জেনে বাদ্শার দরবারে যাতে পুত্রদের যথাযোগ্য আসন হয়, সেই প্রার্থনা বাদশাকে জানালেন। একদিন তিনি তাঁর পুত্রদের ডেকে বল্লেন, "তোমরা সঙ্গীত শিক্ষা কিরূপ পেয়েছ তা'র পরিচয় দিতে হবে। বাদশার নামে গীত রচনা ক'রে আন ও আমায় শোনাও তারপর বাদশার সামনে তা গাইতে হবে। বাদশা তদনুযায়ী তাঁর দরবারে তোমাদের আসন দেবেন।" পিতার আজ্ঞানুযায়ী জ্যেষ্ঠ শরৎ সেন, মধ্যম সুরত সেন, তৃতীয় তরঙ্গ সেন ও কনিষ্ঠ বিলাস খাঁ এই চারি ভ্রাতা চারিটি গান প্রস্তুত ক'রে আনলেন ও গান গেয়ে একে একে পিতাকে শোনালেন। গানের যে সকল অংশ শ্রীহীন হয়েছিল, তানসেন তা পারিপাটীরূপে সাজিয়ে দিলেন।

অনন্তর তানসেনের অনুরোধে বাদশা চারি ভ্রাতাকে আপন দরবারে গাইতে আহ্বান কর্লেন। নির্দ্ধারিত দিবসে, তানসেন প্রাতঃকালে পুত্রচতুষ্টয়সহ দরবারে উপস্থিত হ'য়ে বাদশাকে বল্লেন, "আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার শক্তির হ্রাস হয়েছে, এখন আমা'র অবসর দিয়ে এই আমার চারি পুত্রদেরে অন্নদান কর্ত্তে আজ্ঞা হয়।" আকবর বল্লেন

"'আচ্ছা, তানসেন তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।" তখন তানসেন পুত্রদের গাইতে বল্লেন। প্রথমে শরৎসেন গান আরম্ভ কর্লেন। তাঁর গানে গুণীগণসহ বাদশা পরম প্রীত হলেন।

তৎপর সুরতসেন গাইলেন। সুরতসেনের গানেও সকলেই মুগ্ধ হলেন। এইরূপে তরঙ্গসেনের গানেও বাদশা সমবেত সুধীমণ্ডলীসহ সবিশেষ আনন্দ লাভ কর্লেন। সব শেষে বিলাস খাঁর গান হ'ল। বিলাস খাঁর গানে বাদশা ও গুণীগণ শুধু আনন্দিতই হলেন না, যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিতও হলেন। বাদশা উল্লাসিত কণ্ঠে বল্লেন, যে তানসেন ও স্বামী হরিদাসের পর এরূপ গান তিনি কখনও শোনেন নি। চৌদিকের গায়ক গুণীবৃন্দের উচ্ছল হর্ষরোলে সভাস্থল মুখরিত হ'য়ে উঠ্ল—সবাই একবাক্যে বল্লেন "তানসেন! এই পুত্রই তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় রাখবে।" তানসেন তখন বাদশাহকে সেলাম কর্লেন। বাদশা তখন সেই চারি ভ্রাতাকে প্রত্যেককে সহস্র মুদ্রা ক'রে পারিতোষিক দিলেন ও প্রত্যেকের মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত ক'রে তাঁর দরবারে সম্মানিত আসন দান কর্লেন। তানসেনের বৃত্তি মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তানসেনকে এক্ষণে অবসর দেওয়া হ'ল ও তাঁর অবসর বৃত্তি (pension) মাসিক সহস্র মুদ্রা স্থির হ'ল। তানসেন বাদশাকে অভিবাদন ক'রে স্বগৃহে গেলেন ও নিশ্চিন্ত শান্তিতে বিভুগুণগানে ও ঈশ্বরস্মরণে শেষ বয়স যাপন কর্ত্তে লাগ্লেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হ'লে বাদশার কাছে তিনিও আস্তেন আবার বাদ্শাও তাঁর কুশলসংবাদ নিতে তাঁর গৃহে যেতেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর গত হওয়ার পর, তানসেন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ও তাঁর কালব্যাধির সূচনা হ'ল। বাদশা তাঁকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আগ্রায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর আরোগ্যের আর আশা রহিল

না। তানসেন গোয়ালিয়রে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন কিন্তু বৈদ্যগণ ভয় পেলেন, গোয়ালিয়রে যাবার চেষ্টা করলে পথেই তানসেনের মৃত্যু হতে পারে ব'লে তাঁদের আশঙ্কা হ'ল। তখন বাদশা তানসেনের শয্যাপার্শ্বে এসে তাঁর গোয়ালিয়র যাত্রার সংকল্প ত্যাগ কর্ত্তে বল্লেন। তানসেন বাদশাকে দেখে সাশ্রুলোচনে বল্লেন "খোদাবন্দ! আর কি দেখছেন? আমার অন্তকাল সমাগত। গোয়ালিয়রে যদি যেতে না দেন, তবে আমার সমাধি যেন ওথায় হয়।" বাদশা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন; শেষ সময় আসন্ন হ'য়ে এল। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে পুনরায় বাদশা গেলেন। বাদশাকে দেখে তানসেন তাঁর শেষ গান গাইলেন। বাদশা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বালকের ন্যায় কেঁদে ফেল্লেন। তানসেন অতঃপর গম্ভীরভাব ধারণ ক'রে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। বাদশা বিদায় নিলেন। কিয়ৎকাল পরে তানসেন তাঁর চারিপুত্র ও শিষ্যদিগকে আহ্বান ক'রে বল্লেন "আমি এখন চ'ল্লাম, তোমরা আমার কাছ থেকে যে সঙ্গীত সাধনা পেয়েছ আশীর্ব্বাদ করি আমার মৃত্যুর পর এই দৈবপ্রভাব-পূর্ণসঙ্গীত তোমাদের মাঝে যেন অমর হ'য়ে থাকে। আমার মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহ মাঝখানে রেখে চারিধারে সকল গুণী ও সাধকগণ বসে গান গাইবে। যার গানে আমার মৃতদেহের দক্ষিণ হাত উত্থিত হবে, তারই বংশাবলীক্রমে সঙ্গীতসাধনা জাজ্জ্বল্যমান থাকবে।" তানসেনের এই শেষ বাণীর পরেই তাঁর পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে অমৃতধামে প্রয়াণ করল (ইংরাজী ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দ ফেব্রুয়ারী, বাংলা ৯৯২ সন ফাল্গুন মাস)। মৃত্যুকালে তানসেনের বয়স আশী বর্ষ হয়েছিল। তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ তাঁর ভক্ত শিষ্যগণ ও অন্যান্য সঙ্গীত সাধকগণ তাঁর মৃতদেহ পরিবেষ্টন ক'রে একে একে গান

গাইতে লাগলেন। জনৈক য়ুরোপীয় রাজদূত তথায় উপস্থিত ছিলেন। মৃতদেহের হস্ত যে উত্থিত হ'তে পারে একথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পারেন নি। বস্তুতঃ কাহারও গানেই এ অসম্ভব সাধিত হ'ল না—পরিশেষে তানসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিলাস খাঁ সেই য়ুরোপীয়কে সম্বোধন ক'রে "কোন্ ভ্রম ভুলোরে মন অজ্ঞানী!" তোড়ি রাগিণীর এই ধ্রুপদটী গাইলেন। তাঁর গীতের সঙ্গে মৃত তানসেনের দক্ষিণ হস্ত উত্থিত হ'ল। য়ুরোপীয় দূত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন ও তখন সকলেই বিলাস খাঁকে তানসেনের সাধনার যথার্থ উত্তরাধিকারীরূপে বরণ ক'রে নিলেন।

গীতশেষে মহাসমারোহে তানসেনের মৃতদেহ গোয়ালিয়রে নিযে যাওয়া হ'ল। তথায় হজরত মহম্মদ গওসের সমাধির নিকটে তাঁর দেহ সমাহিত হ'ল। শাহ্ আকবর সমাধির উপরে একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত ক'রে দিলেন। সেই চন্দ্রাতপ আজও রয়েছে। তানসেনের সমাধির নিকট একটি তেঁতুল গাছ জন্মেছিল। সেই গাছ আজ পর্য্যন্ত রয়েছে। গায়কগুণীদের বিশ্বাস সেই তেঁতুল গাছের পাতা খেলে কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়।

মিঁয়া তানসেনের জীবন সম্বন্ধে আমরা যতটা তথ্য সংগ্রহ কর্ত্তে পেরেছি পূর্ব্বেই তা বর্ণন করেছি। হিন্দুসঙ্গীতের সুপ্রাচীন উৎকর্ষের যুগে, হিন্দুরাজত্বকালে সঙ্গীতের স্বরূপ কি ছিল তা আমরা জানি না। তবে আবুল ফাজল বলেছেন, তানসেনের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে থেকে সারা ভারতের সমস্ত অতীত ইতিহাসের আলোচনা কর্লেও তাঁর সঙ্গীতের তুলনা মিলে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐতিহাসিক ভারতে বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে তানসেনই সঙ্গীতজগতের একচ্ছত্র সম্রাট—এক্ষেত্রে স্বামী হরিদাসের কথা আলোচনাযোগ্য নয় কেননা তাঁর

সঙ্গীত মর্ত্ত্যবাসীদের জন্য ছিল না, সে ছিল "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।"

তানসেনের গান সম্বন্ধে জনৈক হিন্দুস্থানী কবি গেয়ে গেছেন যে বিধাতা সর্পের কান না দিয়ে ভাল করেছেন নতুবা তানসেনজীর তান শুনে অনন্তনাগের মাথা দুলে উঠত, মেদিনী ছারখার হয়ে যেত-'ভালো ভয়ো যো বিধি না দিয়ে শেষনাগকে কান'—তানসেন কবিদের কল্পনার মানসলোকেও রহস্য-গরিমামণ্ডিত আসন অধিকার করে আজো রয়েছেন। বোধ করি তাঁর সে আসন চিরদিনই অক্ষুন্ন থাক্‌বে।

তানসেনের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজামান ও তাঁর পত্নী মৃগনয়নী হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নবপ্রাণ, অ নবার চেষ্টা করছিলেন, আমরা পূর্ব্বে একথা লিখেছি। অপর এক দম্পতীর কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন—পাঠানরাজ রাজবাহাদুর ও তাঁর হিন্দু নটী পত্নী রূপমতী; তাঁদের বিচিত্র মধুর প্রেমলীলা বহু হিন্দুস্থানী ধ্রুপদে বিবিধ রাগরাগিণীতে নিবদ্ধ রয়েছে। অনেক কবির কাব্য ও অনেক শিল্পীর চিত্র তাঁদের প্রণয় কাহিনী থেকে প্রেরণা পেয়েছে।

বলা বাহুল্য এঁদের সঙ্গীত তানসেনের বিশ্ববিজয়ী সঙ্গীতের অগ্রদূত। তানসেনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অকস্মাৎ একযোগে উদিত হ'তে দেখি সঙ্গীত সৌরাকাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য জ্যোতিষ্মান্ গ্রহ উপগ্রহ—তানসেন যাঁদের মাঝখানে আদিত্যের ন্যায় দীপ্তি পেয়েছেন।

তানসেনকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জনক আমরা ব'লে থাকি। তাঁর সমসাময়িক যত গুণী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই প্রথমটা তানসেনের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হ'লেও, পরে সকলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার তো করলেনই, শিষ্যত্বও গ্রহণ করলেন। তানসেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুপদী রীতিকে পরম গৌরব ও মহিমা দান ক'রে গিয়েছেন। প্রাচীনতর

যুগে উচ্চ সঙ্গীতকে "প্রবন্ধ" বলা হ'ত। যথাযোগ্য "ছন্দে" গীত "প্রবন্ধ" কেই উচ্চ সঙ্গীত বলা হ'ত। এই "প্রবন্ধ সকল অধিকাংশ সংস্কৃত বা প্রাকৃতে রচিত ছিল। পাঠানযুগে নায়ক গোপাল "ছন্দ-প্রবন্ধে" অদ্বিতীয় ছিলেন ও নায়ক উপাধি পেয়েছিলেন। তবে তিনি ও তাঁর সমসাময়িক সঙ্গীতবিদ্ বৈজু বাওরা, ছন্দ প্রবন্ধ থেকে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের প্রচলন করেন। এরূপে ধ্রুপদের প্রথম আদর্শ পরিচয় আমরা নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওয়ার যুগেই প্রথম পাই। তার দুই তিন শত বৎসর পর রাজা মান প্রভৃতিরা ধ্রুপদী রীতির মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের পুনরুত্থানের পথ দেখালেন। স্বামী হরিদাস ও তানসেন ধ্রুপদকে পূর্ণ পরিণতি দান করলেন। ধ্রুপদই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদি প্রেরণা ও তার অন্তর প্রবাহিনী জীবনধারা। তাই তানসেনকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদি পুরুষ ও পিতা বলতে আমরা অকুণ্ঠীত।

তানসেন সঙ্গীত প্রভাবে সারা ভারত ছেয়ে ফেলেছিলেন। অসংখ্য সঙ্গীত সাধক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যে সকল গুণী তাঁর চরণতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রধান যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। যথাঃ—খোদাবক্স্, মসনদ আলী খাঁ, রামদাস, সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, মামুদ খাঁ, খাণ্ডেরাও, সুন্দীবর খাঁ, চাঁদ খাঁ, সুরয খাঁ, রমজান্, লাল খাঁ, নিজাম খাঁ, হোসেন খাঁ, শোভা খাঁ, বীরমণ্ডল, মলিন খাঁ, চঞ্চল শশী, ভীমরাও তাজবাহাদুর, ভগবান দাস, চন্দ্রলাল ও দেবীলাল।

ইঁহারা সকলেই অসাধারণ গুণী ছিলেন। তবে তানসেনের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ। তানতরঙ্গ ও মান-তরঙ্গকে তানসেন পুত্রবৎ দেখতেন। তানতরঙ্গের বংশাবলী আজও

পশ্চিম ভারতে বিগুমান। তবে শিষ্যগণ অপেক্ষা তানসেনের পুত্রগণ (শরৎসেন' সুরতসেন, তরঙ্গসেন ও বিলাস খাঁ) ও জামাতা মিশ্রী সিংজী সঙ্গীত সাধনায় যে অধিকতর অগ্রসর ছিলেন, তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান যে সকল সঙ্গীত গুণীবংশ আজো বিদ্যমান, তাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ বা পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেহই তানসেনের শিক্ষা ও বা প্রভাবের বহির্ভূত নন্। হিন্দুস্থানের যাবতীয় গায়ক তন্ত্রকার ও সঙ্গীতের সর্ববিভাগের সকল গুণীগণ তানসেনের বিদ্যারই কিছু না কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তানসেনের সঙ্গীতেই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া আজকের এই বহুলবিচিত্র হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরূপে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

তানসেনের সঙ্গীত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নির্ব্বিচারে চতুর্দ্দিকেই বিকীর্ণ হয়েছিল তবে আধারভেদে কোথাও তা উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হয়েছে কোথাও বা মলিন হ'য়ে গেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, তানসেনের শেষ প্রত্যাদেশ অনুযায়ী সাধনা পরীক্ষায় শুধু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ সাফল্য লাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ তানসেনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিলাস খাঁর বংশাবলীতেই তানসেনের সাধনা এ যুগ অবধি মূর্ত্ত ও জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে এসেছে। তানসেনের দুহিতা সরস্বতী দেবী ও তাঁর স্বামী মিশ্রীসিংজীর বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিখেছি। তাঁরাও সঙ্গীতসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে আর্য্যাবর্ত্তে বিলাস খাঁ ও মিশ্রীসিংজীর বংশেই নাদবিদ্যা সাধন প্রভাবে এ যুগ পর্য্যন্ত জীবন্ত ও উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তা বিশদ্‌রূপে লিখব।

তানসেন কণ্ঠসঙ্গীতে ও মিশ্রীসিংজী যন্ত্রসঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখেছি। বিলাস খাঁর বংশাবলীতে তানসেনের সাধনা ও

মিশ্রীসিংজীর বংশে বীণাসাধনা বংশপরম্পরাক্রমে চলে এসেছে। তবে এই উভয় বংশের বিদ্যা পরস্পর সংযোগে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। বিলাস খাঁর বংশধরগণ কালক্রমে তন্ত্রসাধনায়ও অশেষ সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, অপর দিকে মিশ্রীসিংজীর পত্নী সরস্বতী দেবীর কণ্ঠসঙ্গীতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন তাঁর বংশীয় বীণাকারগণও কণ্ঠসঙ্গীতে প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। উভয় বংশেই কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে সিদ্ধ অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন।

তানসেন নিজে গায়ক হলেও যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর দান বড় সামান্য নয়। রবাব বা রুদ্রবীণা তাঁর প্রতিভা প্রসূত। তানসেনের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাঁর বংশাবলীতে যন্ত্রসঙ্গীতের এমন একটা নূতন ধারা এনেছে যা প্রাচীন ভারতের বীণাকরনেও পাওয়া যায়না। তানসেন নিজেও রাবাব উৎকৃষ্ট বাজাতেন। মনীষী Rev. Popley'ও এ'বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন—রবাব সম্বন্ধে তিনি 'The Music of India'য় লিখেছেন' The great Tan Sen played this instrument. It is a handsome instrument and has a very pleasing tone fuller than that of the Sarangi ; it leads itself to the graces better than the sitar as it has no frets.'

Rev. Popley, তানসেনের বংশধরদের সম্বন্ধে লিখেছেন—"The descendants of Tansen divided themselves into two groups :—The Rababiyas and the Binkars, The former used the new instrument Rabab, invented by Tansen, while the latter used the Vina or Bin. Two descendants of these were living at Rampur, a state which has been famous for many centuries for its excellent musicians.

The representative of the Binkars was Mahamad Wazir Khan whose paternal ancestor was Niamat Khan Shah Sadarang at the court of Emperor Mahammad Shah & Mahammad Ali Khan was the representative of Rababiyas.................Tansen was a great Dhrupad singer and Rampur is the home, to-day, of some of his celebrated descendants who are experts at this style of singing.'

Popley সাহেব তানসেনের বংশধরদের রবাবী ও বীণকার এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, রবাবীদের মূল পুরুষ তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ, ও বীণকারদের আদি প্রবর্ত্তক তানসেনের জামাতা মিশ্রীসিংজী। ভারতের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রালাপ এই দুই বংশথেকেই বেরিয়েছে। মিশ্রীসিংজীর ইতিহাস আমরা পূর্ব্বেই লিখেছি। তাঁর প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত ও তন্ত্রে বিচিত্র ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সমৃদ্ধ সম্বরাজ সক প্রতিভার পরিচয়ই আমরা পাই। অপরদিকে বিলাস খাঁর সাত্বিক প্রতিভা থেকে যে সঙ্গীত সাধনা কুল পরম্পরায় চলে এসেছে তা'র অনাড়ম্বরতা ও নিরাভরণ শান্ত সৌন্দর্য্য আমাদের স্পর্শ করে থাকে। উভয়ের আদর্শই মহান এবং গরিমামণ্ডিত। সুতরাং রবাবী ও বীণকার এ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর তা নির্ণয় করার সাধ্য নাই।

মিশ্রীসিংজীর সঙ্গে তানসেন দুহিতা সরস্বতী দেবীর পরিণয় সঙ্গীত-রাজ্যে যে এক অভিনব সার্থকতা এনেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মিশ্রীসিংজীর উন্নত ও উন্নত প্রতিভা সরস্বতী দেবীর বর্ণবিলাস বিচিত্র, ললিত, মনোহর, সঙ্গীত-সুষমার সংযোগ যে বীণাকরণ ও ধ্রুপদবাণীর সৃষ্টি করেছিল তাতে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের, তীব্রতা ও

কমনীয়তার এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখে আমরা আজও পুলকিত ও মুগ্ধ হই। এই সার্থক পরিণয়ের ফলেই শা সদারঙ্গ, নির্ম্মল শা ও উজীর খাঁর ন্যায় সঙ্গীতের যুগপ্রবর্ত্তকদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

বিলাস খাঁর সঙ্গীত সাধনার ধারা কিছু অন্যরূপ ছিল। তিনি মিশ্রীসিংজীর ন্যায় কর্ম্মযোগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অরণ্যবাসী উদাসীন, সুরের সন্ন্যাসী। তিনি বিবাহ করেছিলেন সত্য, ভারত সঙ্গীতের মেরুদণ্ডস্বরূপ বিরাট্ প্রতিভাবাহী সাধক বংশের তিনি জনক সত্য, তবু তাঁর জীবন সংসারের জন্য ছিল না, তিনি ছিলেন একান্তই আরণ্যক, নিঃসঙ্গ যোগী। তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারা দরবারে গাইতেন ও বাদশার কাছে প্রচুর পারিতোষিক পেতেন, কিন্তু বিলাস খাঁর অর্থ প্রতিপত্তির দিকে কোনও খেয়ালই ছিল না। তিনি অহোরাত্র বনে জঙ্গলেই কাটাতেন। নাদ সাধনায় তিনি ছিলেন তন্ময়। সংখের মধ্যে গোচারণ ছিল তাঁর অবসরবিনোদনের প্রধান উপায়। বৃন্দাবনের গোপবালকদের ন্যায় তিনি ছিলেন সরলাত্মা, পবিত্র ঈশ্বরের পরম কৃপাভাজন।

পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর কোনও দৃষ্টিই ছিল না। তাই তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে অনেক সময় ক্লেশে পড়তে হত। একদা তাঁর পত্নী তাঁকে বল্লেন যে তাঁর ভ্রাতারা ও ভ্রাতৃবধূরা কত সুখে ও ঐশ্বর্য্যে রয়েছে, আর তাঁর নিজের ও নিজ পরিবারের দৈন্যের অন্ত নেই—এত উদাসীনতা কি ভাল? বিলাস খাঁ তাই শুনে বহুদিন পরে বাদশার দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। বাদশা ফকীর বিলাস খাঁকে হঠাৎ আবির্ভূত দেখে পরম সমাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন ও তাঁর গান শুনে এত আহ্লাদিত হলেন যে তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারা দরবারে বহুবৎসর গান গেয়ে যে অর্থ

পেয়েছিলেন, সেই পরিমাণ অর্থ তখনই বিলাস খাঁকে পারিতোষিক স্বরূপ দান করলেন।

বিলাস খাঁ সহস্র সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করে, সেই টাকা তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে পুনরায় অরণ্যে চলে গেলেন। আর কখনও তিনি সংসারে ফিরেন নি।

বিলাস খাঁ সাহেব রবাব ও বীণা এবং নাদ সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ বৈরাগী ভগবদ্ভক্ত ছিলেন আজও তিনি সারা ভারতে পূজিত. তাঁর তুল্য মহাত্মা ও সাধুপুরুষ সঙ্গীত জগতে খুবই বিরল। তিনি একপ্রকার তোড়ি রাগিণী সৃষ্টি করে গেছেন—বিলাস খানি তোড়ি নামে তা আজও গীত ও বাদিত হয়। বিলাস খানি তোড়ি এক আশ্চর্য্য ও জনপ্রিয় রাগিণী।

ভারতবর্ষে সাহিত্য, সঙ্গীত শিল্পকলা এ সবই অধ্যাত্মসাধনার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই ভারতের কবি, গায়ক ও শিল্পীদের জীবনে অধ্যাত্মপ্রভাব আমরা চিরদিনই দেখে এসেছি। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতর জনক স্বামি হরিদাস সিদ্ধকোটির অন্তর্গত ছিলেন, বৈকুণ্ঠ-বিহারি শ্রীহরির পার্শ্বদস্থানীয় নারদাদির স্থায় নিত্য সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তানসেনও অতি উন্নত সাধক ছিলেন আমরা দেখেছি। তানসেনের বংশধরগণ সঙ্গতের মধ্য দিয়ে একটী সুপ্রাচীন সাধনধারা বহন করে এনেছেন।

আপনাদের অবগতির জন্ত তানসেনের পুত্রবংশ ও দৌহিত্রবংশের বিস্তৃত বংশ-তালিকা এক্ষণে আমরা প্রকাশিত করছি।

তানসেনের পুত্রবংশ (রবাবীবংশ)

ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ, জীবন খাঁ (শাহ)
বাকর খাঁ। হায়দর খাঁ। বাহাদুর খাঁ।
ছজ্জু খাঁ।
জাফর খাঁ। প্যার খাঁ। বাসৎ আলি খাঁ। কন্যা
বাহাদুর হুসেন খাঁ।
আলি মহম্মদ খাঁ। (বড়কু মিঞা)
মহম্মদ আলি খাঁ। (মঞ্ঝলু মিঞা)
রিয়াসত আলি খাঁ। (নন্‌কু মিঞা)
আলিবক্স খাঁ।
সৌকত আলি খাঁ।
কাজিম আলী, সদিক্ আলী, আহমদ আলী, নিসারালী খাঁ।
কাসিম আলী খাঁ। কন্যা (আমীর খাঁ বীণকারের পত্নী)

তানসেনের দৌহিত্র বংশ (বীণকার বংশ)

জীবন শা
প্যার খাঁ। অংলীকট্ (অঙ্গুলি হীন)
ছোটে নবাৎ খাঁ।
নির্মোল শা
ওমরাও খাঁ।
কন্যা।
আমীর খাঁ।
রহীম খাঁ।
(অমীর খাঁ। রবাবী কাসিম আলী খাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন)
মহম্মদ উজীর খাঁ।
ফিদা হুসেন খাঁ।
নাজির খাঁ।
নাসির খাঁ।
সগির খাঁ।
দবীর খাঁ।
দিল্‌দার খাঁ।
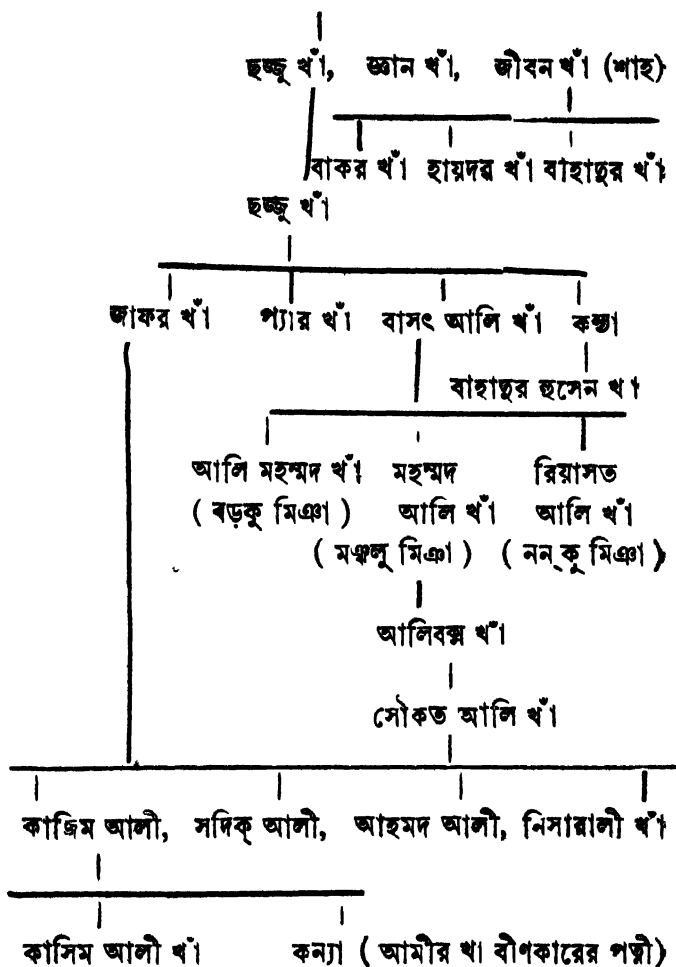
তানসেন-বংশীয় পরবর্ত্তী গুণীগনের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা একবার 'কাওয়ালি' সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে নিতে চাই। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুই শতাব্দী পূর্ব্বে পাঠান সম্রাট্ আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে নায়ক গোপাল ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন—তিনি "ছন্দপ্রবন্ধ" গাইতেন—ধ্রুপদ গানের সূচনাও তাঁর সময় থেকেই হয়। সঙ্গীতের সন্ন্যাসী বৈজু বাওরাও তাঁরই সমসাময়িক। বৈজু বাওরা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকালয়ে অধিক সময় থাকতেন না ও বাদ্‌শার দরবারে তাঁর উপস্থিতি খুবই দুর্ল্লভ ছিল। নায়ক গোপালই তখন দরবারের রত্নস্বরূপ ছিলেন ও বিদ্যা প্রভাবে নিখিল গুণীমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। পরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জনৈক পারস্য-দেশীয় অভিজাতবংশীয় গুণী পাঠান দরবারে আবির্ভূত হন। এই পারস্যদেশীয় গুণীর নাম 'আমীর খস্‌রু'। আমীর খসরু উৎকৃষ্ট গায়ক ও নানা বিদ্যা সম্পন্ন ছিলেন—কাল ক্রমে ইনি আলাউদ্দিনের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন ও বিশিষ্ট আমাত্য পদ লাভ করেন। ইনি শ্রুতিধর ছিলেন। একদিন দরবারের অন্তরাল থেকে নায়ক গোপালের সব রাগরাগিণী শুনে, পরে প্রকাশ্য সভায় নায়ক গোপালকে সেই সকল রাগ রাগিণী হুবহু শুনিয়ে দিলেন ও উপরন্তু পার্‌সী কতকগুলি রাগের সহিত এ রাগের মিশ্রণে কয়েকটী নূতন রাগ রচনা ক'রে নায়ক গোপালকে শুনালেন। সেই দিন হ'তে দরবারে আমীর খস্‌রুর প্রধান আসন হ'ল।

আমীর খস্‌রু হিন্দু সঙ্গীতে পার্‌সী প্রভাব এনেছিলেন। রাগ রাগিণী গঠনের এক অভিনব প্রণালী তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আমাদের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বদলে তিনি রাগের "বাইশ

মোকাম' বা দ্বাবিংশতি প্রকার বিভাগ ক'রে গেছেন। তাঁর পদ্ধতিকে কাওয়ালি পদ্ধতি বলা হয়। এই কাওয়ালি রীতি অনুযায়ীই 'খেয়াল' গাওয়া হ'য়ে থাকে—আমীর খস্রুই খেয়ালের জন্মদাতা। তাঁর উদ্ভাবিত রাগিণীগুলির মধ্যে "ইমন্" রাগিণী আজও এদেশে গায়কগণের বিশেষ প্রিয়। তিনি ভারতীয় "হিন্দোল" রাগ ও পারসী "মোকাম" রাগ সম্মিলিত করে "ইয়ামন" বা "ইমন্" রাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন। আমীর খস্রু কণ্ঠসঙ্গীতে যেমন "খেয়াল" গানের সৃষ্টি করেছিলেন তেমি যন্ত্রসঙ্গীতেও "সেতার" যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর সুদর্শন শাস্ত্রীর গ্রন্থে আমরা পাই, আমীর খস্রু তিন তার জুড়িয়ে সেতার যন্ত্র প্রথম তৈরী করেছিলেন। পারসী ভাষায় তিন সংখ্যাকে "সেহ্" শব্দে অভিহিত করা হয়। তিন তার বিশিষ্ট ব'লে এই যন্ত্রের নাম, আমীর খসরু "সেহ তার" বা "সেতার" রেখেছিলেন। আমীর খসরু সেতারে গৎ তোড়ার প্রচলন করেন, তখনও সেতার যন্ত্রে আলাপ বাজাবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। "খেয়াল" গান ও সেতার বাজানাকেই "কাওয়ালি" সঙ্গীত বলা হ'য়ে থাকে।

আমীর খসরুর ঐতিহাসিক বিবরণ Rev. Popley দিয়েছেন :—

"Amir Khasru was a famous singer at the court of Sultan Allauddin (A. D. 1295-1316). He was not only a poet and musician but also a soldier and statesman and was a minister of two of the Sultans. The "Kawali" mode of singing—a judicious mixture of Persian and Indian models was introduced by him. ...The Sitar, a modification of the Vina was first introduced by him."

আমীর খসরুর প্রবর্ত্তিত কাওয়ালি সঙ্গীত কিন্তু পরে ম্লান যান, স্বামী হরিদাস ও তানসেনজীর প্রবর্ত্তিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের কাছে এতই নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছিল যে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কোনও সত্যকার রসস্রষ্টা খেয়াল গান বা সেতারের দিকে মোটেই আকৃষ্ট হন নি। ধ্রুবপদ যদ্দ্বারা লাভ হয়, তাকেই "ধ্রুপদ" বলা হয়। ধ্রুপদ সঙ্গীত আমাদের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মসাধনার গভীর প্রেরণা অনুসরণ ক'রে চলেছিল। "কাওয়ালী" গানের সঙ্গীতকে "খেয়াল" বলা হ'ত—কেন না তাতে আধ্যাত্ম প্রেরণা ছিল না কিন্তু সরস কল্পনাবৃত্তির খেলা ছিল। ধ্রুপদীগণকে "মিষ্টিক্" ও খেয়ালদিগকে "রোমাণ্টিক্" বলা যেতে পারে।

তানসেনের বংশধরগণও চিরদিনই এই মিষ্টিক্ সঙ্গীতেরই অনুসরণ ক'রে চলে এসেছেন। এজন্য তাঁদেরে "কলাবিদ" বলা হ'ত, কারণ তাঁরা "কলাবিজ্ঞান সম্পন্ন" ছিলেন। কলাবিদ্যা বল্‌তে শুধু Art বুঝায় না। আমাদের শাস্ত্রে 'কলাবিদ্যার' অর্থ আরো গভীর। "কলা" মানে শাস্ত্রে "শক্তি" বুঝিয়েছে। পরাপ্রকৃতিই এই শক্তি। সৃষ্টির আদি কারণস্বরূপিণী মহাশক্তি নাদরূপে জগতের বিকাশ করেছেন। নাদ দ্বিবিধ—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক নাদ হ'তে বেদ বা অপৌরুষেয় মন্ত্রের উৎপত্তি—ধ্বন্যাত্মক নাদ হ'তে সপ্তস্বর ও রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি। এই নাদ বিদ্যাকেই কলাবিদ্যা বলা হয়। তাই "কলাবিদ" হ'তে পারা যে গভীর সাধনা সাপেক্ষ তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তানসেন একজন প্রকৃত কলাবিদ্ ছিলেন—তাঁর বংশধরগণও কলাবিদ্যারই উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরে দেখলেন যে এই বিদ্যার অধিকারী সর্ব্বসাধারণ হ'তে পারেনা। অথচ সর্ব্বসাধারণকে সঙ্গীত শিক্ষা তাঁদের দিতে হ'ত। তাই ধ্রুপদ সঙ্গীত ও বীণা বা

রবাব উন্নত অধিকারীদের জন্য রেখে সাধারণের জন্য তাঁরা খেয়াল বা সেতারের প্রচার কর্লেন। বিলাস খাঁ বংশীয় মসিদ্ খাঁ ঔরংজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীদরবারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেতারের তার বাড়িয়ে ও তাতে চিকারির তার বসিয়ে ধ্রুপদ-ভাঙ্গা বিলম্বিত গৎ সেতারে প্রচলিত কর্লেন। বীণার দীর্ঘ মিড় খণ্ড খণ্ড ক'রে সেতারের উপযুক্ত এক প্রকার আলাপরীতি সৃষ্টি কর্লেন ও তানতরঙ্গবংশীয় "সেণী" দিগকে সেতার শিক্ষা দিলেন। এইরূপে "মসিদ্‌খানি বাজনা''র উৎপত্তি হ'ল। তবে বলা বাহুল্য সেতারের বাজনা মসিদ্ খাঁর নিজ-বংশীয় কোনও গুণী অবলম্বন করেন নি। তাঁরা শিষ্যদের জন্যই উক্ত পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ক'রেছিলেন। মসিদ্ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁও উৎকৃষ্ট বহু গৎ রচনা ক'রে গেছেন।

অমীর খসরু প্রবর্ত্তিত সেতার যন্ত্রের প্রচার ও উন্নতি সাধন যেমন মসিদ্ খাঁ করলেন তেমনি আমীর খসরুর উদ্ভাবিত খেয়াল সঙ্গীতের নূতন প্রাণ দিলেন—নিয়ামৎ খাঁ শাহ সদারঙ্গ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইঁহারা কেহই কাওয়ালী সঙ্গীতের অনুসরণ ক'রে আপন শিল্পপ্রতিভার প্রকাশ করেন নাই। ইঁহারা উভয়েই ধ্রুপদী ও বীণকার ছিলেন—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য কাওয়ালী সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রচার করেছিলেন। এ থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে ধ্রুপদী ইচ্ছা করলে খেয়ালকে ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারেন, কিন্তু কোনও খেয়ালী ধ্রুপদের কোনও নূতন মার্গ দেখাতে পারেন না। ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের স্বীকার না ক'রে উপায় নাই।

শা সদারঙ্গের পৈতৃক নাম নিয়ামৎ খাঁ। তিনি তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় লাল খাঁর পুত্র ছিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষক্রমাগত বীণাবাদনতত্ত্বে পরম বিশারদ ছিলেন। পূর্ব্বেই আমরা দেখেছি তানসেনের পুত্রবংশে রবাব

যন্ত্র ও দৌহিত্রবংশে বীণাবাদন প্রচলিত ছিল। নিয়ামৎ খাঁর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। তখন তানসেনের পুত্রবংশীয় গোলাব খাঁ দিল্লী দরবারে অতি সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও বাদশাহ মহম্মদ শাহের সঙ্গীতগুরু ছিলেন। গোলাব খাঁ মুখ্যতঃ গায়কই ছিলেন। তাই গোলাব খাঁ যখন গাহিতেন তখন নিয়ামৎ খাঁকে বীণাদ্বারা তাঁর সঙ্গীতের অনুসরণ করতে হ'ত। গোলাব খাঁর আসনের পশ্চাতে নিয়ামত খাঁর আসন পড়ত। গায়ক অপেক্ষা তন্ত্রকারের সম্মান তখনও কিছু অল্প ছিল। নিয়ামৎ খাঁ এতে মনঃক্ষুন্ন হ'য়ে দুই বৎসর কাল বাদশার দরবারে আসা বন্ধ করে দিলেন। এই দুই বৎসর তিনি দুইটি ভিক্ষুক বালককে খেয়াল সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন—ইহাই কাওয়ালী সঙ্গীতের নবজন্মের মূল ইতিহাস। বালকদ্বয়ের কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল এবং দুই বৎসর শিক্ষার পর তারা খেয়াল গানে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় মন অধিকার করে বস্‌ল। বাদশা সেই বালকদ্বয়ের সংবাদ মন্ত্রীমুখে শুনতে পেয়ে তাদেরে দরবারে আহ্বান কর্‌লেন এবং অভিনব প্রণালীর গান শুনে মুগ্ধ হ'লেন। নিয়ামৎ খাঁ এদের গুরু একথা জান্‌তে পেয়ে বাদশা মহম্মদ শা নিয়ামৎ খাঁকে শ্রেষ্ঠ গুণীর আসন দিয়ে দরবারে পুনরায় আমন্ত্রণ কর্‌লেন। নিয়ামৎ খাঁর দরবারে পুনঃ প্রবেশের পর তিনি যে সম্মান পেলেন তা মিঁয়া তানসেনের পর কোনও গুণী দিল্লী দরবারে পান নাই। নিয়ামত খাঁর আসন বাদশার সিংহাসনের পার্শ্বে করা হ'ল এবং বাদশা তাঁকে সখারূপে গ্রহণ কর্‌লেন। নিয়ামৎ খাঁকে আর ধ্রুপদী গোলাব খাঁর সঙ্গে বীণায় অনুসরণ কর্‌তে হ'ত না তাঁর বীণা বাদশাহ পৃথক্‌ভাবে শুন্‌তে সুরু কর্‌লেন। বীণার সম্মান কণ্ঠসঙ্গীতে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল।

এই সময় বাদশাহ নিয়ামৎ খাঁকে "শাহ" উপাধি প্রদান করলেন। দিগ্বিজয়ী বাদশাকে শাহ বলা হ'ত—আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাই। সেরশাহ্, বাদশা আকবর প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সম্রাটগণ শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। নিয়ামৎ খাঁকেও বাদশা শ্রেষ্ঠ গুণী বিবেচনা ক'রে শাহ্ উপাধি প্রদান করেছিলেন। তানসেনের দৌহিত্র বংশের আরো দুইজন বীণকার দিল্লীদর বার থেকে "শাহ" উপাধি পেয়েছিলেন তাঁরা নিয়ামৎ খাঁর বংশধর জীবন শাহ ও নির্মল শাহ। সঙ্গীত বিদ্যায় শিল্পপ্রকাশ মহিমায় তাঁরা সমসাময়িক গুণীমণ্ডলীর মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেই শাহ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

বাদ্শা মহম্মদ শা নিয়ামৎ খাঁর নূতন নাম দিলেন "শাহ সদারঙ্গ"। সদারঙ্গ নামটারও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। নিয়ামৎ খাঁ বীণায় ও কণ্ঠসঙ্গীতে "খোসরঙ্গ" বা হৃদয়গ্রাহী বৈচিত্র্য সুষমা এত প্রচুর পরিমাণে এনেছিলেন যা পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সঙ্গীতসাধক আন্তে পারেন নাই। সদা তাঁর সঙ্গীতে রঙের উজ্জ্বল্য লক্ষিত হ'ত ব'লে তাঁর নাম সদারঙ্গ রাখা হয়েছিল। তানসেন দুহিতা সরস্বতী দেবীর সঙ্গীতে নারীপ্রতিভাসুলভ বর্ণ বৈচিত্র্যসম্ভারের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, সুতরাং নিয়ামৎ খাঁ রঙের এই বিচিত্রপ্রকাশকৌশল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। আলো ছায়ার বিচিত্র সংমিশ্রণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচিত্র বর্ণের সুচারু সামঞ্জস্যে যেমন চিত্রের শোভা বৃদ্ধি হয় সেইরূপ নিয়ামৎ খাঁর সঙ্গীতে সূক্ষ্ম সুরনিচয়ের শ্রুতির ও মীড় গমকের মনোহর সম্মিলনের ফলে বৈচিত্রে, ঐশ্বর্য্যে ও সৌকুমার্য্যে শ্রবণ মন পুলকে অভিভূত না হয়ে পারে না।

শাহ সদারঙ্গকে বাদশা মহম্মদ শা অর্থ ও পারিতোষিক এত দিতেন যা' আজ শুনলে রূপকথার মত মনে হবে। শোনা যায় বহু সোনা, রূপা ও জহরৎ বখ্‌শিস্‌ স্বরূপ তাঁকে দেওয়া হ'ত। কিন্তু সদারঙ্গজী নিজে ফকিরের মত থাকতেন ও সমুদয় ধনরত্ন পথে পথে গরীব ভিখারীদের দান করে নিজে রিক্ত হ'য়ে পড়তেন। তাই প্রচুর অর্থ পেয়েও তাঁর অর্থের অভাব সর্ব্বদাই থাকত। কোনও দরিদ্রকে তিনি দান না ক'রে পারতেন না। অর্থ ফুরিয়ে গেলে মহাজনদের কাছ থেকে তিনি টাকা কর্জ্জ করতেন ও পরে বাদশাকে সে সব কর্জ্জ শোধ দিতে হ'ত। নিজে সাধু ফকিরের মত বিলাসলেশহীন জীবন যাপন করলেও অতিরিক্ত দানশীলতার জন্ত তাঁকে বিপদে পড়তে হ'ত। তাঁর টাকা কর্জ্জ করার একটা কৌতুককর প্রথা ছিল। মহাজনেরা টাকা দিতে হ'লেই কিছু সম্পত্তি বন্ধক চায়। সদারঙ্গজীর তো জমিদারী ছিল না—তাঁর কাছে মহাজনেরা রাগরাগিণী বন্ধক চাইত। অর্থাৎ টাকা পরিশোধ না করতে পারা পর্য্যন্ত সদারঙ্গজী অমুক অমুক রাগিণী বাদশাহী দরবারে গাইতে বা বাজাইতে পার্বেন না এরূপ করার থাকত। বাদশাহ তারপর যখন সদারঙ্গজ'কে সেই সেই রাগিণী বাজাতে বা গাইতে ফরমায়েস করতেন তখন সদারঙ্গজী বলতেন, 'হুজুর! এই সব রাগিণী অমুক অমুক মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে আমি এত টাকা সংগ্রহ করেছি।" বাদশা সহাস্যমুখে তখন টাকা পরিশোধ ক'রে দিতেন সে এক বেশ কৌতুকপ্রদ ব্যাপার ছিল।

সদারঙ্গজী সত্যই দীনবন্ধু ছিলেন। পূর্ব্বকথিত ভিক্ষুক বালকদ্বয়ের ভরণপোষণ ভার নিজেই বহন ক'রে তাদেরে দরবারে যথোচিত আসন দিয়েছিলেন। সেই ভিক্ষুক বালকদ্বয় "কাওয়াল" ব'লে হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গান তাদের বংশেই শোনা

গেছে। সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালী আহম্মদ খাঁ (যিনি কলিকাতায়ও অনেকদিন ছিলেন) তাঁদেরই বংশধর। কাওয়ালী রীতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা এই বংশেই পাই। প্রসিদ্ধ খেয়ালী তানরাজ খাঁ হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ ও নথ্থু খাঁ প্রভৃতি সবাই এই ভিক্ষুকবংশধরদেরই শিষ্য। অদ্যাপি এঁদের ঘরানা দু'একটি ওস্তাদ রেবা দরবারে বিদ্যমান আছেন।

তবে, শা সদারঙ্গ নিজে খেয়ালী ছিলেন না তিনি খেয়ালের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সদারঙ্গ নিজে সর্ব্বদাই ধ্রুপদ ও হোরি গাহিতেন ও বীণায় ধ্রুপদাদি ও আলাপ বাজাতেন। হিন্দুস্থানের সর্ব্বসাধারণ তাঁর রচিত খেয়াল শুনে চমকিত হয় কিন্তু তাঁর রচিত ধ্রুপদ ও হোরি, যা তিনি নিজ বংশধরদের জন্য ও সঙ্গীতের উত্তম অধিকারীদের জন্য অসংখ্য রচনা করে গেছেন সর্ব্ব-সাধারণ তার পরিচয় খুব অল্পই জানে। যাঁরা তা শুনেছে তারা জানে মাধুর্য্যে ও গভীরতায় উভয়ের কত প্রভেদ। কাঞ্চনের সঙ্গে কাচের তুলনা হয় না। সদারঙ্গজী আপন পুত্রদিগকে উত্তম ধ্রুপদ, হোরি ও বীণার তালিম দিয়েছিলেন তা অদ্যাপি তাঁর বংশে প্রচলিত আছে। তাঁর পুত্র অদারঙ্গ ও অন্যান্য বংশধরেরাও শিষ্যদিগকে খেয়াল শিখাতেন কিন্তু কেহই কখনও দরবারে খেয়াল গান নাই। ধ্রুপদ, হোরি ও আলাপকেই তাঁরা রস প্রকাশের উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট অবলম্বন বলে মনে কর্ত্তেন।

শাহ সদারঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র ফেরোজ খাঁ ও ভূপৎ খাঁ মহম্মদ শার সভা অলঙ্কৃত করে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। ফেরোজ খাঁর উপাধি 'অদারঙ্গ" ছিল ও ভূপৎ খাঁ "মহারঙ্গ" উপাধি পেয়েছিলেন। মহারঙ্গের দুই পুত্র ছিলেন—জীবন শা ও প্যার খাঁ অংশীকট্। প্যার

খাঁকে অংলীকট্ বলা হইত—তার কারণ, অতি বাল্যাবস্থায় প্যার খাঁ রাস্তায় খেলা করছিলেন, এই সময় একটা গরুর গাড়ী গাড়োয়ানের অসতর্কতা নিবন্ধন তাঁর দক্ষিণ হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর উপর দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে তাঁর সেই অঙ্গুলিটী কেটে যায়। এই জন্য তাঁর নাম ছিল অঙ্গুলিকট্ বা অংলীকট। অঙ্গুলীকট প্যারি খাঁ অনেক বয়স পর্য্যন্ত বীণা বাজান নাই। পরে তাঁর ভাই যখন বীণায় বিশেষ কৃতী হ'য়ে উঠ্লেন, তখন তাঁর পিতাকে একদিন দুঃখ ক'রে বল্লেন, যে বয়সও অনেক হ'ল, আঙ্গুলও নেই, তাঁর জীবনে আর বীণা শিক্ষা হবে না—জীবন তাঁর বৃথাই যাবে। মহারজ তখন পুত্রের কাতরতা দেখে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে এমন বীণা শিক্ষা দিবেন যে তাঁর তুল্য বীণকার হিন্দুস্থানে থাকবে না। বস্তুতঃ তাই হ'ল। তাঁর তর্জ্জনীতে একটি বড় মেজ্রাব পরিয়ে দিয়ে মহারজ তাঁকে বীণা শিক্ষা দিলেন। কাটা অঙ্গুল সত্ত্বেও প্যার খাঁ এমন বীণকার হয়ে উঠলেন যে তাঁর তুল্য বীণকার তখন ভারতে আর কেহ থাক্ল না। মহারজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় জীবন খাঁ ও অঙ্গুলীকট্ প্যার খাঁ দিল্লীর দরবারের শ্রেষ্ঠ বীণকাররূপে সম্মানিত হন। তবে প্যার খাঁ খুব দীর্ঘায়ু হন নি, তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জীবন খাঁ বাদ্শাহী দরবার থেকে শাহ্ উপাধি প্রাপ্ত হন। জীবন শাই দিল্লীদরবারের শেষ বীণকার।

মহম্মদ শা বাদ্শার মৃত্যুর পর দিল্লীর মোগলবাদ্শাহী ক্রমে দুর্ব্বল হতে দুর্ব্বলতর হয়ে নামে মাত্র পর্য্যবসিত হয়। বাদ্শা, দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর পর শাহ আলম যখন দিল্লীর তক্তে বস্লেন, তখন তাঁর নাম বাদশা থাক্লেও তাঁর কোনও রাজ্য আর বিশেষ কিছু ছিল না। এই সময় দিল্লী-দরবার বা গুণীসভা ভেঙ্গে যায়। দিল্লী-দরবারের

গুণীসভার শেষ রত্নগণ তখন থেকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়্‌লেন ও অন্যান্য রাজন্যবৃন্দের আশ্রয় গ্রহণ কর্লেন। শাহ আলমের পূর্ব্বে দিল্লীর শেষ দরবারে তানসেনের পুত্রবংশীয় ছজ্জু খাঁ রবাবী ও তাঁর দুই ভ্রাতা জান খাঁ ও জীবন খাঁ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ঐ সময় বীণকারের আসনে জীবন শাহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ছজ্জু খাঁ, জান খাঁ ও জীবন খাঁ এই ভ্রাতৃত্রয়ও অসাধারণ প্রতিভার আধার ছিলেন। ছজ্জু খাঁ রবাব যন্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করে গিয়েছেন। জান খাঁ ও জীবন খাঁ ধ্রুপদী ছিলেন। এই তিন ভ্রাতার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অবদান ভারতীয় চরণে দিল্লীদরবারের শেষ পুষ্পাঞ্জলি।

মোগল রাজত্বের পর দিল্লীর গুণীমণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে, ভারতের দুই অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। তানসেনের নিজ বংশধরগণ পূর্ব্বদিকে চলে এলেন, (তাঁদের নাম পূরবীয়া) ও তাঁর শিষ্যবংশীয় গুণীগণ রাজপুতনায় রাজাদিগের সভায় স্থান পেলেন তাঁদের নাম হ'ল পাঁছিমওয়ালা। তানসেনের পুত্রবংশীয় রবাবীগণ ও দৌহিত্রবংশীয় বীণকারগণ পূর্ব্বভারতে এসে বারানসীধামে ভদ্রাসন স্থাপন ক'রে নিকটবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান রাজা ও নবাবদের সম্মানিত পূজা-উপচার লাভ কর্লেন। ঐ সময় অযোধ্যা নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেবার রাজা, বারানসীর নরেশ ও অন্যান্য অনেক নৃপতি সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী, এমন কি অনেকে সঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্তও ছিলেন। দিল্লী থেকে রবাবী ও বীণকারগণ চলে আসার পর এই নৃপতিগণ তাঁদেরে এত আগ্রহের সহিত বরণ ক'রে নিয়েছিলেন যে তাঁদের কোনও দুঃখ-কষ্টের মুখ কখনও দেখ্‌তে হয় নাই। তানসেনের বংশধরগণ যখন দিল্লী ছেড়ে পূর্ব্বভারতে চলে আসছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে একজন বড় ধ্রুপদীকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌লেন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের

মহারাজা। বাংলাদেশে ধ্রুপদ গানের বহুল প্রচার ও আদরের মূল ইতিহাস এখানে আমরা পাই। বিষ্ণুপুরের মহারাজা রবাবী ছজ্জু খাঁর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র ও ধ্রুপদী জীবন খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁকে বাকুড়া বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন ও তাঁকে যথোচিত সম্মান ও সমাদরের সহিত রেখেছিলেন। বাহাদুর খাঁ কয়েকজন উত্তম বাঙ্গালী ধ্রুপদী শিষ্য তৈরী করে গিয়েছেন। তিনি কখনও বিদ্যা গোপন করেন নি। পরলোকগত বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ৺যদু ভট্ট বাহাদুর খাঁরই শিষ্যবংশীয় ছিলেন। যদু ভট্টের ন্যায় গায়ক ভারতে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব স্বর্গীয় ৺রাধিকা গোস্বামী ও বাংলার বর্ত্তমান ধ্রুপদী সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বাহাদুর খাঁর শিষ্যঘরানাদার। অনেকে বলেন যে, "সেনী"গণ কাহাকেও শিখান না—এ কথা যে কত ভুল তা বুঝতে পারি তখনই যখনই দেখি—সুদূর দিল্লী থেকে তানসেনের বংশধর জনৈক গুণী বাংলায় এসে উৎকৃষ্ট শুদ্ধ বাণীর ধ্রুপদ কত বহুল পরিমাণে ও অকপটে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন—যার ফলে ৺যদু ভট্ট রাধিকা গোস্বামী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত গুণীর উদ্ভব বাংলায় সম্ভব হয়েছে।

বীণানায়ক জীবন শাহের দুই পুত্র ছোট নবাৎ খাঁ ও নির্ম্মল শাহ বীণাকরণ নৈপুণ্যে ভারতে অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে গেছেন। ছোট নবাৎ খাঁকে সকলেই বল্‌তেন যে স্বয়ং মিশ্রীসিং পুনরায় জন্ম নিয়ে এসেছেন। তাঁর অপর নাম ছিল রসবীণ খাঁ। পণ্ডিত প্রবর সুদর্শনাচার্য্যশাস্ত্রীজী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"নবাৎ খাঁজীকে বংশমে অন্তমে রসবীণ খাঁজী ভারি বীণকার হোয়ে, লোগ ইনকো দুসরে নবাৎ খাঁজী কহতেথে য়ে প্রথম এর্‌সে হি ফিরা করতেথে, এক দিন এক সমাজমে নিয়াদর পা কর সিতাসে খানেকে

সংখিয়া খাজা, পিতাসে বহুৎ সমঝায়া কহা কি সংখিয়া খানেকী কোই জরুরত নহি, পরিশ্রম করো, চবিশ দিনমে তুম্‌সে বীণা বজবা দেঙ্গে। ঐসা হি কিয়া, ফির্ তো য়ে বীণাকে অদ্বিতীয় ওস্তাদ্ হোগয়ে।"

অর্থাৎ নবাৎ খাঁজীর (মিশ্রীসিংজীর) বংশে শেষদিকে রসবীণ খাঁজী খুব বড় বীণকার হয়েছিলেন লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় নবাৎ খাঁ বলত। ইনি প্রথম জীবনে অমি ঘুরে বেড়াতেন। একদা লোক সমাজে অনাদর পেয়ে পিতার নিকট সেকোবিষ চেয়েছিলেন। পিতা (জীবন শা) তাঁকে তখন খুব বোঝালেন যে সেকোবিষ খেতে হবে না পরিশ্রম করলে চব্বিশদিনের মধ্যে তাঁর হাতে তিনি বীণা বাজিয়ে দিবেন। বস্তুতঃ তাই তিনি করেছিলেন ও পরে রসবীণ খাঁ বীণায় অদ্বিতীয় গুণী হয়েছিলেন।

ছোট নবাৎ খার হাতে এত মিষ্ট সুর ছিল যে গুণীগণ তাঁকে আদর করে 'রজ্জাব্জ' বলে ডাকতেন। ছোট নবাৎ খাঁর পুত্র ওমরাও খাঁ-ও পৈতৃক গুণ এবং বিদ্যা সম্পূর্ণরূপেই পেয়েছিলেন। নির্ম্মল শাহ ছিলেন ছোট নবাৎ খাঁ বা রসবীণ খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁরা দুই ভাই, উভয়েই এত বড় গুণী ছিলেন যে এঁদের মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করা সুকঠিন। নির্ম্মল শাহকে অযোধ্যার নবাব "শাহ" উপাধি দিয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের প্রায় সকল বড় তারের যন্ত্রবাদকই নির্ম্মল শাহের কোনও না কোনও শিষ্যের ঘরানা। নির্ম্মল শাহের একটা বিষয়ে খুব প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি সঙ্গীতবিদ্যার খুব বিস্তার ক'রে গেছেন, তাঁর শিষ্য অনেক ছিল। কাওয়ালদের মধ্যে প্রসিদ্ধ খেয়ালী শক্কর মখ্খন খাঁ তাঁর শিষ্য। নির্ম্মল শাহ শিষ্যদের অধিকার রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী ধ্রুপদ ও খেয়াল উভয় অঙ্গেরই শিক্ষা দিতেন। তাঁর ধ্রুপদ অঙ্গের শিক্ষা পেয়েছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বীণকার মুসরফ খাঁর

পূর্ব্বপুরুষগণ এবং তাঁর খেয়ালী শিষ্যদের বংশে সুপ্রসিদ্ধ বীণকার বন্দে আলি খাঁ ও মোরাদ খাঁ এবং বিখ্যাত সেতারী ইম্‌দাদ্ খাঁ জন্ম গ্রহণ করেছেন। নির্ম্মলশাহ নিজে খুব শক্তিশালী বাদক ছিলেন। তাঁর বীণায় কমনীয়তা অপেক্ষা শক্তিরই সমাধিক পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর ভ্রাতার বাদ্যে ললিতমধুর রসই প্রকাশ পেত কিন্তু তাঁর বীণায় ছিল উদাত্ত ভাবের রস। বীণার ধ্বনি সাধারণতঃ একটু ক্ষীণ—অধিক দূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না—কিন্তু নির্ম্মল শাহ এত মোটা তারে বাজাতেন যে বড় বড় সভামণ্ডপের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁর বীণার নিক্বণ তীব্রমধুর অনুরণন শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণকুহরে ঝঙ্কৃত হ'ত অতি স্পষ্টভাবে। তিনি ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতে সত্যই এক নূতন প্রাণ সঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন।

নির্ম্মল শাহ ধ্রুপদ অঙ্গের চারি বাণীতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ধ্রুপদ ও বীণার চারি বাণী হচ্ছে গৌড়ীয় বা গোবরহার বাণী, খাণ্ডার বাণী, ডাগর বাণী ও নওহার বাণী।* গৌড়ী বাণীর প্রধান লক্ষণ

---

* "মাদনুল মূসিকী" নামক সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণেতা হাকিম মহম্মদ চারিটী বাণীর উদ্ভাবকদিগের সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—

"আকবর বাদশাহের দরবারে তখন চারিজন মহাগুণী বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম লেখা যাইতেছে—

(১) তানসেন—গোয়ালিয়রবাসী—পিতার নাম মকরন্দ—বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের শিষ্য—পূর্ব্বে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(২) ব্রিজচন্দ—ব্রাহ্মণ—বাড়ী ছিল দিল্লীর নিকটে ডাগুর গ্রামে।

(৩) রাজা সমোখন সিংহ—রাজপুত—বীণকার—খণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী।

(৪) শ্রীচন্দ—রাজপুত—বাড়ী ছিল নৌহার। আকবরের সময়ে এই চারিজনে চারিটী বাণীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ

হচ্ছে প্রসাদগুণ। ইহা শান্তরস উদ্দীপক—ইহার গতি ধীর। বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশই খাণ্ডার বাণীর বিশেষত্ব। ইহা তীব্ররস উদ্দীপক—ইহার গতি খুব বিলম্বিত নয়। গৌড়ী বাণীর অপেক্ষা এর বেগ ও তরঙ্গ অধিক—বলা বাহুল্য প্রচলিত খাণ্ডার বাণী বা সুরের মল্লযুদ্ধ এবং প্রকৃত খাণ্ডারী রীতিতে অনেক তফাৎ। ডাগর বাণীর প্রধান গুণ হচ্ছে সারল্য ও লালিত্য। এর গতি সহজ ও সরল। এর মধ্যে সুরের যে বলয়িত বঙ্কিম বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় বস্তুতঃ তা মোটেই কঠিন নয়। নওহার রীতি বলতে সিংহের গতি বোঝা যায়। এক সুর হ'তে দু-তিনটী সুর লঙ্ঘন করে পরবর্ত্তী সুরে যাওয়া এর লক্ষণ। নওহার খুব বড় কিছু রসের সৃষ্টি করে না—ইহা আশ্চর্য্যরসোদ্দীপক। আমরা যাকে শুধু বাণী বা শুদ্ধবাণী বলি তা গৌড়ী ও ডাগরী বাণীরই নামান্তর। শুদ্ধবাণীই সঙ্গীতের আত্মা। সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠাই যে শুদ্ধবাণীতে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। খাণ্ডার বাণীতে সুরের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য উদঘাটিত হতে পারে যদি তা শুদ্ধবাণীর গতি ও ছন্দ ভঙ্গ না করে। খাণ্ডার বাণী শুদ্ধবাণীর সংশ্রব থেকে বিচ্যুত হ'য়ে চল্লে অতি উৎকট হ'য়ে ওঠে। তার জাঁকজমকে তখন লোক হতভম্ব হ'তে পারে কিন্তু চিত্তের পিপাসা ত তে মেটে না। সে সঙ্গীত প্রাণে কোনও শান্তি বা কোনও আনন্দের পরশ দেয় না। সঙ্গীতের প্রাণ-

---

ছিলেন বলিয়া তাঁর বাণীর নাম ছিল গৌড়ী অথবা গোবরহরী। প্রসিদ্ধ বীণকার সমোখন সিংহ তানসেন কন্যার পাণি গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হইয়াছিল নৌবাদ খাঁ। নৌবাদ খাঁর বাণীর নাম "খাণ্ডারী", কারণ তাঁহার বাসস্থানের নাম ছিল খাণ্ডার। বিজচন্দের বাসস্থানের নাম অনুযায়ী তাঁহার বাণীর নাম হইয়াছে ডাগুর—রাজপুত শ্রীচন্দ নৌহারের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার বাণীকে নৌহারবাণী বলা হয়।

স্বরূপ যে রসবস্তু তার অবিকৃত উৎস পাওয়া যাবে শুদ্ধ বাণীতে। রসের প্রকাশ বৈচিত্র্য সম্ভব তার পক্ষেই, যে সে উৎসের সন্ধান পেয়েছে। তাই সেনীগণ সর্ব্বদাই শুদ্ধবাণীর সঙ্গীতের উপর এত জোর দিয়ে গেছেন। নির্ম্মল শাহের বীণায় খাণ্ডারের তানের ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট থাকলেও, তাঁর বীণাসঙ্গীতের মূল প্রেরণা আসত ধ্যানগম্ভীর ও সাগরগভীর শুদ্ধবাণী থেকে।

সঙ্গীতের চারি বাণীর মধ্যে গৌড়ীয় বাণীকে গুণীগণ রাজার আসন দিয়েছেন। ডাগর বাণীকে মন্ত্রীর স্থান, খাণ্ডারকে সেনাপতির স্থান ও নওহারকে ভৃত্যের স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি বাণীরই আপন আপন স্থানে বিশিষ্ট এক সার্থকতা আছে। তবে প্রথমোল্লিখিত বাণীদ্বয় শুদ্ধবাণীর অন্তর্ভুক্ত। গৌড়ী বাণীর স্বরগুলির প্রত্যেকটি আপন আপন সীমায় সুনির্দ্দিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। স্পষ্টতাই হচ্ছে এই বাণীর প্রধান লক্ষণ। ডাগর বাণীতে একটি স্বর অপরটির সহিত যেন মিশে যেতে চায়, তাই ডাগর বাণীতে একটা কেমন রহস্যময় ভাব থাকে। সুরগুলিকে স্পষ্টভাবে ধরাছোঁওয়া যায় না, শ্রোতার কল্পনা দিয়ে যেন তা'কে পূর্ণ করে নিতে হয়। লালিত্য ও গভীরতা এ উভয় বাণীর মধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। খাণ্ডার বাণীকে সংস্কৃতে "ভিন্না রীতি' বলা হইয়াছে। এই বাণীতে সুরগুলিকে কেটে কেটে গাওয়া হয়—তাই সংস্কৃত একে "ভিন্না" (ভিদ ধাতু হ'তে ভিন্ন শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে) বলা হয়, ও হিন্দুস্থানীতে "খাণ্ডার" বলা হয়। উভয় শব্দের মূল তাৎপর্য্য একই। সুরগুলিকে সরলভাবে প্রকাশ না ক'রে এতে কুটিলভাবেও কেটে কেটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে এতে মাধুর্য্য হ্রাস পায় না। সূক্ষ্ম গমকের সাহায্যে সুর কাটলে বা আন্দোলিত করলে তাতে মধুরতা বৃদ্ধিই পেয়ে থাকে। তাই উত্তম গুণীগণ সূক্ষ্ম মধুর

গমক সহযোগেই খাণ্ডার বাণী গেয়ে থাকেন। গমকের অপপ্রয়োগ ও উৎকট প্রয়োগেই খাণ্ডার বাণীর বিকৃতি এসেছে কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও তানসেন বংশীয় বীণকারগণ অতি সূক্ষ্ম গমক এবং শ্রুতি প্রয়োগে খাণ্ডার বাণীতেও যথেষ্ট মধুরতা প্রকাশ ক'রে গেছেন।

তবে শুদ্ধবাণীকেই সর্ব্বদা রক্ষা করে চলা উচিত। খাণ্ডার বাণী বৈচিত্রের জন্য মাঝে মাঝে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেনীগণ তাই ক'রে এসেছেন। সেনীধ্রুপদের অধিকাংশই শুদ্ধবাণীতে গীত হয়। আলাপের সময় বিলম্বিত অংশে শুদ্ধবাণীরই প্রাধান্য। মধ্যতালে খাণ্ডার বাণী বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রসঙ্গীতে বীণাতেই খাণ্ডার বাণীর মধ্যতাল বা গমক জোড় সেনীগণ রকমারিভাবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু রবাবে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই ত্রিবিধ আলাপ অংশেই শুদ্ধবাণীরই সমান প্রাধান্য আছে। কেন না রবাবের স্বর সরল— রবাবে বীণার ন্যায় গমক তেমন খোলে না।

তানসেনের পুত্রবংশীয় সকল গুণীই গৌড়ীর বাণীতে সিদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁদের গীত ও বাদ্যে রঙ্গের খেলা তত পাওয়া যায় না, কিন্তু রাগের নগ্ন সৌন্দর্য্য প্রকাশে তাঁদের তুলনা হয় না। সরলতাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের প্রকৃতিও তাঁদের সঙ্গীতের মতই সরল ছিল। তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ থেকে সুরু করে হাসান খাঁ, গোলাব খাঁ, ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ, জীবন খাঁ প্রভৃতি গুণীগণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে আমরা দেখ্‌তে পাই, তাঁরা মুনিদের মত সরল অনাড়ম্বর ও ভগবৎপ্রাণ ছিলেন। হাসান খাঁকে সবাই "শুভ্রদেবতা" বা সফেদ্ দেও বল্‌ত, তাঁর অন্তঃকরণও যেমন শাদা ছিল তাঁর শরীরেরও তেম্‌নি এক মনোহর গৌরকান্তি ছিল। এঁরা কেহই বাদশাদের দরবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাক্‌তেন না। ঐহিক ধনরত্নের ও ঐশ্বর্য্যের

আড়ম্বরের বাহিরে নির্জ্জন কুটীরেই এঁরা বসবাস করতেন—বাদশাহগণ অযাচিতভাবে অজস্র অর্থ দিয়ে গেলেও, অধিকাংশ অর্থই এঁদের দানে ও দীনজন-প্রতিপালনে ব্যয়িত হ'ত। বাদশারা যখন তখন ইচ্ছা করলেই এঁদের গীত ও বাদ্য শুনতে পেতেন না। অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে এঁদেরে দরবারে আনতে হ'ত।

হাসান খাঁ ও তাঁর পুত্র গোলাব খাঁ উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী ছিলেন। গোলাব খাঁর তিন পুত্র ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ। ছজ্জু খাঁ রবাবযন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেছিলেন। জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ ধ্রুপদী ছিলেন। এই তিন ভ্রাতার শেষ জীবনেই দিল্লীর বাদশাহি দরবার ভেঙে যায়। ছজ্জু খাঁর তিন পুত্র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ। জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন। জীবন খাঁর দুই পুত্র বাহাদুর খাঁ ও হায়দর খাঁ। বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের মহারাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হ'য়ে বঙ্গদেশে চলে এলেন ও হায়দর খাঁ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন ক'রে ফকীর হ'য়ে গেলেন। বাহাদুর খাঁর বাঙ্গালী শিষ্য বংশের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। হায়দর খাঁ ফকীর ছিলেন ও সঙ্গীত-সাধনায়ও বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এক ধ্রুপদী শিষ্যের বংশ কানপুরের নিকটে এখনও আছে। লক্ষ্ণৌর গুণী রাজা নবাব আলি খাঁ সাহেব তাঁদেরে বিশেষ সম্মান ও প্রশংসা ক'রে থাকেন।

ছজ্জু খাঁর তিন পুত্র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁর নাম ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই ভ্রাতৃত্রয় সত্য সঙ্গীতের অবতার স্বরূপ ছিলেন। গীতে, বাদ্যে, বিদ্যায় ও সাধনায় এঁদের স্থান তৎকালে সকলের শীর্ষে ছিল। এঁরা সত্যই নায়কপদবাচ্য ছিলেন। জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ, পিতা ছজ্জু খাঁর কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন কিন্তু বাসৎ খাঁর গুরু ছিলেন তাঁর খুল্লতাত

জ্ঞান খাঁ। জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন বলে ভ্রাতষ্পুত্র বাসৎ খাঁকেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে'ছলেন ও তাঁকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলেন। বাসৎ খাঁকে তিনি যোগসাধনা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তদ্ভিন্ন নির্ম্মল শাহ বীণকারও এই ভ্রাতৃত্রয়কে খুব ভালবাসতেন. এঁদের প্রতিভা অতি বাল্য হ'তেই স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছিল ও নির্ম্মল শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নির্ম্মল শাহ ছিলেন তানসেনের দৌহিত্র-বংশীয়, তাই এঁদের তিনি জ্ঞাতি সম্বন্ধে গুরু ছিলেন ও এঁদের সস্নেহে বীণা শুনাতেন ও বীণার গূঢ় রহস্য সকল শিখে দিয়েছিলেন। নির্ম্মল শাহের পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁর সমুদয় বিদ্যা তাঁর ভ্রাতষ্পুত্র উমরাওকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। উমরাও ছিলেন প্যার খাঁর সমবয়সী ও অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ। কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে তাঁদের প্রতিযোগিতাও খুব তীব্র ছিল। জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ এই তিন ভ্রাতা ও ওমরাও খাঁ এঁরা সকলেই একই সময়ে একই স্থানে বাল্যজীবন অতি-বাহিত করেছিলেন—ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও নির্ম্মল শাহের ন্যায় সঙ্গীত সিদ্ধ হয়েছিলেন গুরুদেব স্নেহ-ছায়ায়। তাই এঁদের মাঝে সঙ্গীত সাধনার বীজ সুসময়ে সুক্ষেত্রে পতিত হ'য়ে, কালে ফুলে ফলে সুশোভিত বিশাল সঙ্গীত-তরুরূপে হিন্দুস্থানের অসংখ্য সঙ্গীতপিপাসুদিগকে কল্প-বৃক্ষের ন্যায় আশ্রয় দিতে পেরেছে।

জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ বাল্যকালে নির্ম্মল শাহের সহিত একত্রে অনেকদিন বসবাস করেছিলেন ও বীণা শিক্ষালাভ করেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহীর অবসানের পর তানসেন বংশীয় গুণীগণ বারাণসীতে ভদ্রাসন স্থাপন ক'রে সমীপবর্ত্তী রাজন্যবৃন্দের সভায় যাতায়াত করতেন। কোনও গুণী অযোধ্যার দরবারে, কেহ রেবাধিপতির সভায় কেহবা বেতিয়ার নরেশের রাজসভায় আহুত হ'য়ে যেতেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত

তাঁরা বাঁধাবাঁধিভাবে কোনও দরবারে বা সভায় থাকেন নি। বৎসরের মধ্যে ইচ্ছামত নানা সময়ে নানা সভায় যেতেন—যেখানে যেতেন সেখানকারই নরেশ বা নবাব নিজেকে ধন্য মনে ক'রে তাঁদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করতেন। তবে বৎসরে একবার ক'রে তানসেনবংশীয় সকল গুণীই বারাণসীতে সম্মিলিত হ'তেন, একটা পারিবারিক প্রীতি-সম্মিলন বৎসরে একবার ক'রে অনুষ্ঠিত হ'ত। তখন প্রত্যেক গুণী নিজ নিজ গুণ ও বিদ্যার পরিচয় দিতেন। বাসৎ খাঁ, প্যার খাঁ ও জাফর খাঁকে নির্ম্মল শাহ একবার মাসাধিক কাল ধ'রে প্রত্যহ বীণা শোনাতেন ও বীণা বাদনের কৌশল বোঝাতেন, তিনি প্রত্যহ নূতন নূতন প্রণালীতে নায়কী তার থেকে মন্দ্রের তারে গিয়ে মন্দ্র ষড়্‌জ স্বর এভাবে খুলতেন যে সেই ভ্রাতৃত্রয় বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন। নির্ম্মল শাহ্‌ কি ক'রে মুদারা গ্রাম থেকে বিদ্যুৎঝলকের মত উদারা গ্রামের স্বর সকল প্রকাশিত করতেন—"বীণার সারি বা পর্দ্দায় কত রকমের অঙ্গুলির খেলা সম্ভব তা' দেখে ভ্রাতৃত্রয় বিস্মিত হ'তেন কিন্তু মাসাধিক কাল শুনেও সেই কৌশল হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। অবশেষে নির্ম্মল শাহ্‌ তাঁদেরে তা' বুঝিয়ে দেন।

কিন্তু নির্ম্মল শাহ্‌ যখন গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন, সেই সময় তাঁর পুত্রতুল্য ও ছাত্রোপম জাফর খাঁ নিজ প্রতিভাবলে তাঁর সমকক্ষ স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। একবার বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনে যখন সকল গুণী কাশীধামে সমাগত, তখন কাশী-নরেশের সভায় নির্ম্মল শাহের বীণা ও জাফর খাঁর রবাব বাজনা অনুষ্ঠিত হয়। তখন বর্ষাকাল। রবাবের চামড়া বর্ষাকালে শিথিল হয়ে যায় ব'লে বর্ষায় রবাবের আওয়াজ চেপে যায় ও এক প্রকার শ্রুতিকর্কশ 'ঢপ্‌ ঢপ্‌' শব্দ বাহির হয়। তাই নির্ম্মল শাহএর অপূর্ব্ব বীণা ঝঙ্কারের পর

রবাবের আওয়াজ অতি বিশ্রী লাগিল। জাফর খাঁ তখন বাজনা ক্ষান্ত ক'রে কাশী-নরেশ ও নির্ম্মল শাহকে বললেন যে, একমাস পর তিনি বাজনা শোনাবেন। এই একমাসে জাফর খাঁ বারাণসীর যন্ত্রের-কারিগর দ্বারা এক অভিনব যন্ত্র নির্ম্মাণ করালেন। এই যন্ত্র রবাবেরই ন্যায়—তবে এতে চামড়া নাই, নিম্নাংশে চামড়া ও কাঠের পরিবর্ত্তে ইহাতে আছে সুরবাহারের মত লাউ ও উপরিভাগে স্বরোদের মত কাঠের দন্তের উপরে ষ্টীল প্লেট বসানো। রবাবে তাঁত্ বাজে আর ইহাতে ষ্টীল ও পিতলের তার ব্যবহৃত হয়। জাফর খাঁ এই যন্ত্রের নাম দিলেন 'সুরশৃঙ্গার'। বীণা ও রবাব এই উভয় যন্ত্রের বিভিন্ন 'বাজ্' বা বাদনপ্রণালী মিশ্রিত ক'রে তিনি সুরশৃঙ্গার যন্ত্র প্রবর্ত্তিত করলেন। একমাস পর সুরশৃঙ্গার যন্ত্র নিয়ে তিনি কাশী-নরেশের কাছে গেলেন ও এক প্রকাণ্ড সভা আহ্বান ক'রে নির্ম্মল শাহকে নিমন্ত্রিত করালেন। সুরশৃঙ্গারের স্বর এত সুমিষ্ট যে ইহার তারগুলিতে শুধু ঝঙ্কার দিলেই প্রাণ শীতল হয়ে যায়, সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে যখন বীণা ও রবাবের সমুদয় আলাপ-অঙ্গ দেখিয়ে জাফর খাঁ বাজালেন তখন নির্ম্মল শাহ্ জাফর খাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন "বাঃ বেটা! তুমি আজ বীণাকে হারিয়ে দিয়েছ।" একেই বলে "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ শিষ্যাৎ পুত্রাৎ পরাজয়ম্।" জাফর খাঁর নবগৌরবে নির্ম্মল শাহের বুক উল্লাসেই ভরে উঠল।

অতঃপর রবাবী বংশীয় গুণীগণ বর্ষাকালে রবাবের পরিবর্ত্তে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রই বাজাতেন। শীতকালে এবং মৃদঙ্গ সঙ্গতের সময় রবাব ব্যবহার করতেন, কেননা মৃদঙ্গ সঙ্গতে রবাব শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। অদ্যাপি এই রীতি চ'লে আসছে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রাগভাগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তানসেনবংশীয় কয়েকটী উজ্জ্বল প্রতিভা-

শালী তন্ত্রকারকে যুগপৎ দেখ্‌তে পাই। ভারতীয় সঙ্গীতের তন্ত্র-বিভাগের ইহা একটি অতি গৌরবময় যুগ। কণ্ঠ-সঙ্গীতের শীর্ষস্থান যন্ত্র-সঙ্গীতেয় অধিকার ক'রে বসার কারণ আছে। প্রথমতঃ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ সঙ্গীতে যে প্রচুর প্রাণশক্তির সংহত ও বিশাল আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বে পাওয়া যেত, পরবর্ত্তী যুগে তা কমে এসেছিল। প্রাণের বিশালতা ধীরতা ও একতানতার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সেই সাধনার উপযোগী আধার সংখ্যা হ্রাস পেযে এসেছিল। প্রাণায়ামকে ব্যাপকতর অর্থে আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি, তবে সঙ্গীতকে এক শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম বলে বুঝতে পারি। প্রাণ য়ামের ফল প্রাণের উপর সম্পর্ণ অধিকার —প্রাণের ব্যাপ্তি ও প্রাচুর্য্য। পরবর্ত্তী গুণীদের দেহযন্ত্রে যখন প্রাণের ধারণ সামর্থ্য কমে এল তখন তাঁরা বাহিরের বীণা যন্ত্রেই প্রাণের বিকাশের সমুদয় সাধনা নিযোগ করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যন্ত্র সঙ্গীতের উৎকর্ষের দ্বিতীয় কারণ, যন্ত্র-সঙ্গীতে যে ধরনের বৈচিত্র্যের বিকাশ যতটা সম্ভব হয, কণ্ঠ সঙ্গীতে তা সম্ভব নয়। কণ্ঠের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হ'বার কারণ এই যে উহা সহজাত ও কণ্ঠের সুরকে যথেচ্ছভাবে খেলানো যতটা সহজ, একটা বাহিরের জড়যন্ত্র থেকে সুর বাহির ক'রে তাকে ইচ্ছামত খেলানো তত সহজ নয়। কিন্তু যন্ত্র জড় বলেই তার সুবিধাও আছে—যা'ন্ত্রিক সুবিধা এই যে মানুষের কতক-গুলি স্বাভাবিক সীমা আছে, যন্ত্র জড়বস্তু—জড়ের সে সীমা নাই. জড়ের পরিশ্রম হয না, জড় হ'তে এমন অনেক সুবিধা পাওয়া যায়, জীবিত প্রাণীর কাছ থেকে যা পাওয়া সম্ভবপর হয় না। মোটর গাড়ীর সুবিধা অশ্বযানে যেমন পাওয়া সম্ভব নয়। জড়ের সহিত চেতনের পার্থক্য চিরকালই রহিয়াছে—ভবিষ্যতেও থাকিবে।

যন্ত্র-সঙ্গীতে "দ্রুত" অংশের উৎকর্ষ অনেক বেশী—কণ্ঠ হতে "বেসুর" দূর করা কঠিন কিন্তু যন্ত্রকে সুন্দর ভাবে বাঁধ্‌লে সুমিষ্ট স্বর উহা হ'তে স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

বলা বাহুল্য, কণ্ঠ সঙ্গীতে যেমন প্রাণায়াম বা শ্বাসের উপর অধিকার প্রয়োজন, যন্ত্র সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্যও একটা প্রাণের স্থৈর্য্য প্রয়োজন —চঞ্চল প্রাণ নিয়ে গভীর ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের বিকাশ কখনও সম্ভব নয়।

গত শতাব্দীর সেনীগুণীগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট যন্ত্র সঙ্গীতের বিকাশ খুবই হ'য়ে গেছে। জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে এবং ওমরাও খাঁ বীণাযন্ত্রে সঙ্গীতের এত গভীর ও উন্নত স্তর খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, যে কণ্ঠ সঙ্গীতের উন্নতির অভাব সত্ত্বেও কোন প্রকার অভাব কেহ বুঝতে পারে না। প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ শুধু যন্ত্র-সঙ্গীতে নয়—কণ্ঠ সঙ্গীতেও অসাধারণ প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তি দেখিয়ে গেছেন। প্যার খাঁ অতি সুমধুর কণ্ঠ-গায়ক ছিলেন, আর বাসৎ খাঁ তো শেষ বয়সে শুধু গানই গাইতেন। বাসৎ খাঁ অনেক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ রচনা ক'রে গেছেন।

জাফর খাঁ ছিলেন যন্ত্র-সঙ্গীতে সিদ্ধ—অতি কঠোর তপস্যায় তিনি "রবাবী" সঙ্গীত পদ্ধতিকে যন্ত্র-সঙ্গীতের শীর্ষস্থানে তুল্‌তে পেরেছিলেন। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের অপরূপ লালিত্য ও আবেশময় মাদকতা তাঁরই দান। প্যার খাঁও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রই অধিকাংশ সময় বাজাতেন। জাফর খাঁও প্যার খাঁ উভয় ভ্রাতাই অনেক সময় স্বনামধন্য, প্রতিভার অবতার স্বরূপ রাজারাম বংশীয় রেবাধিপতি মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের সভায় থাক্‌তেন। মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে বাংলা কোনও মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি সূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী মহাশয় অনেক

আলোচনা করেছেন। মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ সঙ্গীত বিদ্যায়ও অতি পারদর্শী ও যথার্থ সঙ্গীত-সাধক ছিলেন। তিনি জাফর খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন ও অনেক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ রচনা ক'রে গেছেন। রাজারাম ও রাজা মানের পর সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধনায় হিন্দু নৃপতিগণের মধ্যে মহারাজ বিশ্বনাথের নাম অগ্রগণ্য চিরদিন থাক্‌বে।

প্যার খাঁও মহারাজ বিশ্বনাথের সভায়ই থাক্‌তেন, তবে মাঝে মাঝে বেতিয়ার মহারাজ নন্দকিশোরের দরবারেও যেতেন। নন্দকিশোর একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী ছিলেন ও অনেক ধ্রুপদ নিজে রচনা ক'রে কথক ব্রাহ্মণ গায়কদেরে শিক্ষা দিতেন। বেতিয়ার 'কথক' ঘরানা ওস্তাদ্‌রা তাঁর শিষ্যবংশ থেকেই এসেছেন। বেতিয়ার কথক ঘরানা ব্রাহ্মণ গায়কদের মধ্যে বখ্‌তাওরজী শিবনারায়ণজী, গুরুপ্রসাদজী প্রভৃতি গুণীগণের নাম উল্লেখযোগ্য। বোধ হয় একথা অনেকে জানেন কলিকাতায় বিখ্যাত ধামার গায়ক বিশ্বনাথ রাও এই শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য ছিলেন এবং ৺রাধিকা গোস্বামী অনেক দিন গুরুপ্রসাদজীর কাছে শিখেছেন। বিখ্যাত গায়ক কাশীনাথও বেতিয়ার ঘরানা ছিলেন। বেতিয়ার মহারাজ নন্দকিশোর প্যার খাঁর শিষ্য ছিলেন। এই থেকেই আমরা দেখ্‌তে পাই, ভারতের সমস্ত ঘরানা গুণীরাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তানসেনের বংশের কাছে ঋণী।

প্যার খাঁ সাহেব শুধু একজন অদ্বিতীয় সুমিষ্ট গায়ক বা বাদকমাত্র ছিলেন না—তিনি সঙ্গীতেরও একজন উচুদরের স্রষ্টা ছিলেন। তিলক-কামোদ রাগিণীর নাম সঙ্গীত রসিক মাত্রেই জানেন। তিলক-কামোদের গভীরতা কম নয় অথচ ইহা এত শ্রুতিমধুর যে অশিক্ষিতদের প্রাণও এই রাগিণীতে সাড়া না দিয়ে পারে না। এই তিলক-কামোদ্ রাগিণীটি প্যার খাঁর সৃষ্টি। তিনি এক অতি নগণ্য সুর

থেকে এই সুমিষ্ট রাগিণীটি তৈরী করেছিলেন। এক দিন প্যার খাঁ গ্রাম্যপথে বিচরণ করছিলেন—কোনও কুটিরে একটি গ্রাম্য- স্ত্রীলোক গ্রাম্যসুরে একটি ছড়া গাইতে গাইতে যাঁতাতে গম্ পিষ্ছিল। সেই সুরটি প্যার খাঁ সাহেবের কাণে ভারি ভাল লেগে গেল। তিনি দেখলেন, যে সেই সহজ মেঠো সুরে বড় বড় রাগিণীর এক অযত্নসুলভ মিশ্রণ রয়েছে—তাই অবলম্বন ক'রে তিনি তিলক-কামোদ্ রাগিণী তৈরী করলেন। দেশ, বেহাগ ও কামোদ মিশ্রিত ক'রে তিলক-কামোদের সৃষ্টি হ'ল। তিলক-কামোদ সঙ্গীত-জগতে অমর হয়ে রইল। এই রাগিণীতে প্যার খাঁ উৎকৃষ্ট আলাপের পথ খুলে দিলেন ও উৎকৃষ্ট সব ধ্রুপদ এই রাগিণীতে রচনা ক'রে জগতে নিজ সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় দিলেন।

সঙ্গীতপ্রতিভা একেই বলে। রাগরাগিণী মেশাতে অনেকেই অল্প-বিস্তর পারে—কিন্তু এইরূপ মিশ্রণের ফলে একটি স্বতন্ত্র প্রাণবন্ত রাগিণী সৃষ্টি করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। এই ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই যথার্থ কলাবিদ্। প্যার খাঁর এই ক্ষমতা ছিল—আর তিনি ছিলেন অতি প্রাণস্পর্শী কলাবিদ্। বিদ্যায় মানুষের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হ'তে পারে বটে কিন্তু মাধুর্য্যে মানুষের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। প্যার খাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে ও সুরশৃঙ্গারে এক অপরূপ উন্মাদনী ও দ্রাবিনীশক্তি ছিল, যা তাঁর সমসাময়িক খুব গুণীরই ছিল। প্যা খাঁ রবাবী যন্ত্রসঙ্গীতের গাম্ভীর্য্যের সাথে বীণকারের মোহন ঝঙ্কার মিশিয়েছিলেন, ধ্রুপদের ধায় উদাত্ত রসে হোরীর লালিত্য মিশিয়ে ছিলেন—এই মিশ্রণের ফলেই তাঁর সঙ্গীত সম্মোহনগুণে ও চিত্তাকর্ষণে অতুলনীয় স্থান অধিকার করেছিল।

প্যার খাঁর যুগপৎ উত্তরসাধক ও প্রতিযোগী ছিলেন বীণ্কার ওমরাও খাঁ। এঁদের সঙ্গীত পদ্ধতি পরস্পরের অনুরূপ ছিল। এঁদের

সঙ্গীতে উজ্জ্বলরসের যেমন আধিক্য দেখতে পাই—এঁদের ছন্দে তেমনি পাই একটা লীলায়িত লাস্য। হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে এঁরা সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য প্রচুর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা অযোধ্যা, বেত্তিয়া, রেবা, টংক প্রভৃতি দরবারেই অধিকাংশ সময় যাপন কর্‌তেন। শিষ্য এঁদের অনেক ছি'ল। অনেক গুণী আছেন, যাঁরা গুণ ও বিদ্যার প্রসারে বিশেষ পটু নন, যদিচ তাঁরা স্রষ্টা ও গুণী হিসাবে খুব মহনীয় স্থান অধিকার করেছেন। তাঁদের অন্তঃকরণ অতিরিক্ত কেন্দ্রমুখী হওয়ায় তাঁরা বিদ্যা ছড়াতে পারেন নি। জাফর খাঁর ও তাঁর যনামধন্য তিন পুত্র কজিম্ আলি, সাদিক আলি ও নিসারালি খাঁর নাম এ ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। এঁদের নাম সঙ্গীত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকবে—কিন্তু এঁদের কলাসৃষ্টি এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আজ তার কোনও চিহ্ন কোথাও পাব না—কিন্তু প্যার খাঁর কলা-সৌন্দর্য্য জাফর খাঁর সৃষ্টি চেয়ে গরিমাময় না হ'লেও তার প্রসার ছিল অনেক ব্যাপ্ত। প্যার খাঁর সঙ্গীত দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল—কেননা তিনি সৌন্দর্য্য বিতরণ কর্‌তে জান্‌তেন। প্যার খাঁর শিষ্য অসংখ্য ছিল। তবে তাঁদের মধ্যে তাঁর ভাগিনেয় বাহাদুর সেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বেত্তিয়ার রাজা নন্দকিশোর ও টংকের নবাব হসমত জঙ্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওমরাও খাঁর শিষ্যও কম ছিল না। তাঁর দুই পুত্র আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ বীণকার খুব গুণী ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর দুই শিষ্য কুতবুদ্দৌলা ও গোলাম মহম্মদ খাঁ খুব প্রসিদ্ধ। কুতবুদ্দৌলা একজন অমাত্য ছিলেন, তিনি অযোধ্যার নবাবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। কোনও কারণে নবাব ওমরাও খাঁর উপর কোপান্বিত হওয়ায় কুতবুদ্দৌলা ওমরাও খাঁকে সেই গুরুতর বিপদ হ'তে রক্ষা করেন। ওমরাও খাঁ

ভাই কুতবুদ্দৌলাকে উত্তমরূপে সেতার ও বীণ শিক্ষা দেন। গোলাম মহম্মদ খাঁও ওমরাও খাঁর খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তবে তাঁকে বীণা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ওমরাও খাঁ তাঁকে বড় সেতার তৈরী করে তাতেই আলাপ শিখিয়েছিলেন—এইভাবেই সুরবাহার যন্ত্রের উৎপত্তি হয়। গোলাম মহম্মদ খাঁর পুত্র বিখ্যাত সুরবাহারী সাজ্জাদ্ মহম্মদ খাঁর নাম কলিকাতায় সঙ্গীতরসিকেরা নিশ্চয়ই জানেন। সাজাদ মহম্মদ সুদীর্ঘকাল মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সভা-বাদক ছিলেন। কলিকাতায় তাঁর তুল্য সেতারী এবং সুরবাহার বাদক কখনও আসে নি। চলিত কথায় এখনও সবাই বলে 'সাজাদ্ মহম্মদের সঙ্গে সুরবাহার যন্ত্রও মরে গেছে।''

জাফর খাঁ ও প্যার খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসৎ খাঁর নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত। বাসৎ খাঁ ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতনায়ক যথার্থ ছিলেন। গত শতাব্দীতে তাঁর তুল্য প্রতিভাশালী সঙ্গীতক্ষেত্রে আর কেহ ছিলেন না। বাসৎ খাঁর জন্ম আনুমানিক ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতা ছজ্জু খাঁ তখন দিল্লী দরবারের প্রতিষ্ঠাশালী গায়ক ও বাদক—তাই সম্ভবত বাসৎ খাঁর দিল্লী নগরেই জন্ম। ছজ্জু খাঁর অপর ভ্রাতা জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ও ফকীর ছিলেন। অপুত্রক জ্ঞান খাঁ তাই বাসৎ খাঁর বাল্যকালেই ছজ্জু খাঁর নিকট হ'তে তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বাসৎ খা জ্ঞান খাঁর নিকটেই দীক্ষিত ও শিক্ষিত। ছজ্জু খাঁর অপর পুত্রদ্বয় জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষা ও পারদর্শিতালাভ করিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু বাসৎ খাঁর শিক্ষা আরো সর্ব্বোতমুখী ছিল। বাসৎ খাঁ শুধু গান বাজনা বা সঙ্গীত-বিদ্যা নয় সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও পার্শী ভাষায়ও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন ও ফকীর জ্ঞান খাঁর প্রভাবে আবাল্য মানুষ হওয়ায় বাসৎ খাঁর ভিতরে

ধর্ম্মভাবের বিকাশ খুবই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিলো। বাসৎ খাঁ পরিণত জীবনে একজন যথার্থ যোগীপুরুষ হ'তে পেরেছিলেন। জ্ঞান খাঁ প্রকৃতই নাদযোগের যোগী ছিলেন। তিনি বাসৎ খাঁকে বাল্য বয়সে সর্ব্বদা কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করতেন। বাসৎ খাঁর উপর তাঁর স্নেহ খুবই প্রবল ছিল। শোনা যায় বাসৎ খাঁর শিক্ষারম্ভের পর বার বৎসর রবাবে শুধু সর্গম ও নানাবিধ অলঙ্কারই অভ্যাস করতে হয়েছিল—তারপর জ্ঞান খাঁ বাসৎ খাঁকে নানাবিধ রাগ রাগিণী বাজাতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাসৎ খাঁর রবাবের হাত যেমন অতি সুমিষ্ট তাঁর কণ্ঠও তেমনি সুমধুর ছিল। দুঃখের বিষয় বাসৎ খাঁ যৌবন উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই রবাবযন্ত্র ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, যে একবার লক্ষ্ণৌর দরবারে কোনও সাধু মৃদঙ্গী এসে প্রতিযোগিতার জন্য সকল গুণীদের আহ্বান করেন—তাঁর মৃদঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতে কোনও গুণীই গাইতে বা বাজাতে পারলেন না, কেননা সাধুর লয়ের উপর যেরূপ অধিকার ছিল হাতও সেইরূপ অসামান্য তৈয়ারী ছিল। যখন সকল গুণী ই একে একে পরাজিত হ'লেন তখন বাসৎ খাঁ রবাব নিয়ে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হলেন। বাসৎ খাঁর নিকটেই কিন্তু সাধুরই পরাজয় ঘটল। তখন সাধু বাসৎ খাঁর উপর আভিচারিক কোনও অনুষ্ঠান করায় বাসৎ খাঁর দক্ষিণ হস্ত বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তাই শেষজীবন পর্যন্ত বাসৎ খাঁ আর বাজাতে পারেন নি। তবে কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিখিলজনমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও ভাবে বিহ্বল ক'রে গেছেন। একবার তাঁর বিরচিত "দেশ" রাগিণীর একটী গান শুনে ওয়াজেদ্ আলি শা বাদ্‌শা আপন বহুমূল্য হীরকহার কণ্ঠ হ'তে খুলে বাসৎ খাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাসৎ খাঁ লক্ষ্ণৌর দরবার ভেঙ্গেযাওয়ার পর কলিকাতায় এসে

বৎসরাধিক কাল মেটিয়াবুরুজে বন্দী ওয়াজেদ্ আলি শা'র নিকট ছিলেন। সে সময় সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ভূপতি হরকুমার ঠাকুর মহোদয় তাঁর নিকট রবাব ও সেতার শিক্ষা করেন। হরকুমার ঠাকুর একজন আদর্শ রাজা ছিলেন। তিনি সাধকাগ্রণী ছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর যেরূপ অসামান্য অধিকার সঙ্গীত-সাধনায়ও সেরূপই তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতায় একটি বিরাট সভা আহ্বান ক'রে বহু পণ্ডিত ও গুণীসমক্ষে বাসৎ খাঁ সাহেবকে দশসহস্র টাকা পারিতোষিক সহ তাঁকে "সঙ্গীতনায়ক" উপাধি দান করেছিলেন। বাসৎ খাঁ সাহেবও হরকুমার ঠাকুর মহোদয়কে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন যে "ঠাকুর মহোদয় তাঁর যথার্থ সঙ্গীত-শিষ্য"। বাসৎ খাঁ কলিকাতায় অবস্থান কালে বিখ্যাত রবাবী কাশিম আলি খাঁ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাশিম আলি খাঁ বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা জাফর খাঁর পৌত্র ছিলেন। কাশিম আলি খাঁর তুল্য যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী বঙ্গদেশে কথনও কেহ আসেন্‌নি। বাসৎ খাঁর শিক্ষাতেই কাশিম আলি খাঁ এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। বাসৎ খাঁর অপর শিষ্য নিয়ামতুল্লা খাঁ স্বরোদীও ভারতে সুবিখ্যাত। নিয়ামতুল্লার পুত্র কৌকভ খাঁ আজ জগদ্বিখ্যাত। কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবও নিয়ামতুল্লার অপর পুত্র। কলিকাতা মহানগরী কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব ও কৌকভ খাঁ সাহেবের গুণপণার কথা কথনও ভুল্‌তে পারবে না। কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের স্বরোদ শুন্‌বার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে ও যাঁরা তাঁর প্রকৃত তালিমের বাজনা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে কি বস্তু কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আজ ভারত হতে লোপ পেয়েছে। স্বরোদে রবাবের অঙ্গে আলাপ যদি কোথাও কেহ বাজাতে পেরে থাকেন, তবে নিয়মাতুল্লা খাঁ সাহেব ও তাঁর পুত্ররাই শুধু পেরেছেন। অন্যান্য স্বরোদী বীণা ও

সুরবাহারের অঙ্গ নিয়েছেন কিন্তু এঁরাই প্রকৃত রবাব-অঙ্গে বাজাচ্ছেন। বাসৎ খাঁ সাহেবের মাত্র ছয় মাসের তালিমে নিয়ামতুল্লা খাঁ সাহেব ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বরোদী হতে পেরেছিলেন। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারব বাসৎ খাঁ সাহেব কি প্রকার গুণী ও প্রতিভাশালী ছিলেন।

মেটিয়াবুরুজে বাদশা ওয়াজেদ আলি শার সঙ্গীত সভায় বাসৎ খাঁ সাহেব দেড় বৎসরকাল অবস্থিতির পর রাণাঘাটের জমিদার পাল চৌধুরী মহোদয়দের আমন্ত্রণে কয়েক মাসের জন্য রাণাঘাটে ছিলেন। এই সময় ওয়াজেদ আলি শার মৃত্যু হয়। বাসৎ খাঁ সাহেব তাই অন্য কোনও দরবারে যাবেন মনস্থ কর্‌ছিলেন। পাল চৌধুরীরা বিশেষ সম্মানের সহিত বাসৎ খাঁ সাহেবকে রাণাঘাটে রেখে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গীত ও সাহিত্য প্রভৃতিতে বিশেষ উৎসাহ ছিল। কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে পাল চৌধুরীদের কাব্যোৎসাহের পরিচয় আমরা পেয়েছি। সঙ্গীতেও তাঁরা খুবই অনুরাগী ছিলেন।

বাসৎ খাঁ যথার্থ সঙ্গীতানুরাগীদেরে অকপটে ও প্রাণ খুলে শিক্ষা দিতেন কিন্তু যারা প্রকৃত সঙ্গীত সেবক নয়, মাত্র সখের জন্য সঙ্গীত চর্চ্চা করে, তাদেরে কিছুতেই শেখাতেন না। শিক্ষা বিষয়ে তিনি অর্থের দিকে মোটেই লক্ষ্য কর্‌তেন না। তিনি চাইতেন নাদবিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি। এই ভক্তি যেখানে তিনি দেখতেন সেখানেই তিনি মুক্তহস্তে বিতরণ কর্‌তেন। শিষ্যদেরে তিনি এত শেখাতেন, যে তারা শিখে শেষ কর্‌তে পার্‌ত না। রাজা হরকুমার ঠাকুরকে তিনি আন্তরিক স্নেহ কর্‌তেন ও তাঁর অতি গুপ্ত বিদ্যা সম্পদ তাঁকে দান করেছিলেন। হরকুমার ঠাকুর তাঁর শিষ্য হবার পর প্রথম কয়েক মাস তাঁকে তিনি মোটেই শেখান নি। শুধু সর্গম সাধনা করতে

বল্‌তেন। কয়েক মাস পর ঠাকুর মহাশয় তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, এই ভাবে শিক্ষা কর্‌লে কতদিনে শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'বে? বাসৎ খাঁ তখন তাঁকে বল্‌লেন, যে এক্ষণে তাঁর শিক্ষার সময় হয়েছে। তারপর তিনি তিন মাসে এত শেখালেন, যে তরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষার আর কিছুই বাকী রইল না। শিক্ষার এমন কৌশল তিনি জান্‌তেন যে অতি অল্প সময়েই শিষ্যকে সঙ্গীতের অতি গূঢ় ও দুরূহ বিষয়েও পারদর্শী ক'রে তুল্‌তেন। মাত্র ছয় মাসের শিক্ষায় ঠাকুর মহোদয় রবাবে ও সেতারে অতি উচ্চশ্রেণীর যন্ত্রসঙ্গীত আয়ত্ব কর্‌তে পার্‌লেন।

বঙ্গদেশে দেড় বৎসর অবস্থিতির পর গয়ার নিকটবর্ত্তী টিকারি রাজ্যের অধিপতির নিমন্ত্রণে বাসৎ খাঁ গয়ায় গমন করেন। তাঁর অন্তিম জীবন গয়াতেই অতিবাহিত হয়। টিকারি রাজা বাসৎ খাঁকে একটা অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সে সময় টিকারি রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দারুণ দুর্ভিক্ষ চল্‌ছিল। প্রজাদের মধ্যে তখন হাহাকার উপস্থিত। টিকারির রাজা বাসৎ খাঁকে আহবান ক'রে বল্‌লেন, "খাঁ সাহেব আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সঙ্গীতের প্রভাবে অরণ্যে আগুণ জ্বাল্‌তে পার্‌তেন, আকাশ হ'তে বৃষ্টিধারা নামাতে পার্‌তেন! আপনি এক্ষণে এই অনাবৃষ্টি দূর করুন! আপনি মেঘের গান গাইলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে!" বাসৎ খাঁ তখন মহারাজকে বল্‌লেন, "মহারাজ! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ মহাযোগী ছিলেন, কিন্তু আমি সংসারী মানুষ—স্ত্রী পুত্রদের ভরণপোষণ চিন্তায় আমি মগ্ন—শুধু দু'বেলা ভগবানের নাম নিই মাত্র! আমার গানে কি বর্ষা নাম্‌বে?" মহারাজ কিন্তু বাসৎ খাঁকে কিছুতেই ছাড়লেন না—বাসৎ খাঁকে মেঘ ও মল্লারের আলাপ ও গান গাইতে হ'ল। বিধির কৃপায় কিন্তু অঘটন

ঘটল—বহুদিনের অনাবৃষ্টির পর সেদিনই মেঘ ক'রে বৃষ্টি নামল। বাসৎ খাঁ অবশ্য জানতেন যে এটা নেহাৎ দৈবকৃপা। কিন্তু মহারাজার কেমন এক প্রত্যয় হ'ল যে বাসৎ খাঁর সঙ্গীতের ফলেই অনাবৃষ্টির নিবারণ হ'ল। মহারাজা তখন বাসৎ খাঁকে বহু ভূসম্পত্তি নিষ্করভাবে তালুক দিয়ে দিলেন। টিকারি রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়েকটি গ্রাম পুরুষানুক্রমে বাসৎ খাঁ পেলেন। দেহান্তকাল অবধি বাসৎ খাঁ তাই টিকারি রাজ্য পরিত্যাগ করেন নাই। গয়ার কয়েকজন ধনী পাণ্ডাও ঐ সময় বাসৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও বাসৎ খাঁর উপস্থিতিতে গয়া সঙ্গীতের এক প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। গয়ার পাণ্ডাগণ বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রদত্ত পিণ্ডসহ যাত্রীদের দক্ষিণার এক অংশ ঐ সময় বাসৎ খাঁ সাহেবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছিলেন।

বাসৎ খাঁ অতি দীর্ঘজীবি ছিলেন। তাঁর পরমায়ু শতবর্ষ অতিক্রম করেছিল। গয়ায় তিনি অধিকাংশ সময়ই সাধন ভজনে নির্ব্বাহ করতেন। দেবদেবীগণের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন—ফকীরী যোগ সাধনা ও হিন্দু ভক্তি সাধনা উভয়ই তাঁর মধ্যে সমভাবে ক্রিয়া করেছে। অহর্নিশ তিনি নামজপ করতেন ও প্রাণায়ামেও তিনি বিলক্ষণ অগ্রসর ছিলেন। তাই তাঁর অতি দীর্ঘ নিরোগ জীবন হয়েছিল। বাসৎ খাঁ সাহেবের রচিত ধ্রুপদগুলি পাঠ করলে তাঁর হৃদয়ের ভক্তি ও রসের পরিচয় আমরা খুবই পাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাসৎ খাঁ ৺গয়াধামে তিন পুত্র ও এক কন্যার সামনে সজ্ঞানে ঈশ্বরপদারবিন্দ ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে ইহলীলা সংবরণ করেন। বাসৎ খাঁর ন্যায় কৃতী ও সাধক সঙ্গীত জগতে সত্যই বিরল। সেনীবংশেও তাঁর ন্যায় সদানন্দ, নিরভিমান, ভগবৎ নিষ্ঠ নাদ বিদ্যার পরাকাষ্ঠায় উপনীত অপর কোনও সঙ্গীত সাধকের উদাহরণ দুর্লভ।

জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁর সঙ্গীত বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সাদিক্ আলী খাঁ, বাহাদুর সেন খাঁ ও আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিয়া) সাদেক্ আলি খাঁ, জাফর খাঁর পুত্র, বড়কু মিয়াও বাসৎ খাঁর পুত্র কিন্তু বাহাদুর সেন প্যার খাঁর ভাগিনেয়। প্যার খাঁ বিবাহ করেন নাই—তিনি তাঁর ভাগিনেয়কেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন ও সঙ্গীত বিদ্যার উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। সাদেক্ আলি ও বাহাদুর সেন সমবয়সী ও সঙ্গীত বিদ্যায় অতি তীব্র প্রতিযোগী ছিলেন। বাসৎ খাঁর পর এঁদের স্থান সঙ্গীতমণ্ডলে বিশেষ উন্নত হ'য়ে উঠেছিল। সাদেক আলির অন্য আরো তিন ভ্রাতা ছিলেন। কাজাম্ আলি খাঁ ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তৎপর সাদেক আলি নিসারালি ও আমেদ্ আলি। আমেদ্ আলি অল্পায়ু ছিলেন। তাই সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি নিজ গুণপণার পরিচয়ের অবসর পান নি। অপর তিন ভ্রাতাই ভারতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে গেছেন। বঙ্গ-বিখ্যাত রবাবী কাসিম্ আলি খাঁ কাজাম আলি খাঁর পুত্র। কাসিম আলি খাঁর নাম বাংলা আজও ভোলে নি—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতার নামও অমর হয়ে থাকবে। আর সাদেক আলি খাঁকে হিন্দুস্থান কখনও ভোলে নি ও ভুলবে না—কেননা সাদেক আলি অতি শক্তিশালী বাদক ছিলেন ও সঙ্গীত বিদ্যার একজন প্রমাণস্বরূপ ছিলেন। সাদেক আলির মত সুপণ্ডিত কোনও গুণী বাসৎ খাঁর পর আর দেখা যায় নি। বাসৎ খাঁর ন্যায় ইনিও সংস্কৃত ভাষা উত্তম পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষা করেছিলেন ও সঙ্গীত বিষয়ক সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। তবে পাণ্ডিত্য সাদেক আলিকে শুষ্ক করে তোলে নি। পাণ্ডিত্য সাদেক আলির সঙ্গীত সৃষ্টিকে জ্ঞান গরিমায় মণ্ডিত করেছে ও বিদ্যায় গভীর রসস্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। প্রকৃত বিদ্যার

কখনও শুষ্কতা আনয়ন করে না—স্বয়ং বীণাপাণি বাণী বিদ্যাস্বরূপিণী কিন্তু রসের কি কিছু অভাব তাঁর আছে? আমরা বিদ্যার গভীর রসস্তরে প্রবেশ না করে শুধু বাহিরের ব্যাকরণ অলঙ্কার নিয়ে মাথা ঘামাই বলে মনে করি বিদ্যা রসের অন্তরায়, কিন্তু এটা মস্ত ভুল। মস্তিষ্কের শুষ্ক বিদ্যাচর্চ্চা নীরস হতে পারে কিন্তু যে বিদ্যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় তাহা রসের ভাণ্ডার স্বরূপ।

এই রসভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলেই জাফর খাঁ বাসৎ খাঁ ও সাদক আলি প্রাণহীন রসহীন ওস্তাদ মাত্রে পরিণত হন নি—অতি সমৃদ্ধ জ্ঞানসম্পদে পূর্ণ ও প্রাগাঢ় রসের রসিক, অনন্য সামান্য কলাবিদ ও তন্ত্রকাররূপে নিজ নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানকে মহিমান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অপরদিকে বাহাদুর সেনের মধ্যে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট অভাব ছিল বাহাদুর সেনের সঙ্গীতে প্রাগাঢ় রসের পরিচয় আমরা তত পাই না কিন্তু তাঁর রঞ্জিনী শক্তি এত বেশী ছিল যে হিন্দুস্থানে লোকরঞ্জন গুণে বাহাদুর সেনের পদ সকলকে অতিক্রম করেছিল। বাহাদুর সেন প্যার খাঁর নিকট রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর হাতে বিধিদত্ত এক অসামান্য মিষ্টতা ছিল। এই মিষ্টতার গুণে তিনি সকলেরই চিত্ত জয় করে ফেলতেন। কিন্তু বাহাদুর সেনের ধীশক্তি ছিল না তাই রাগ রাগিণীর গূঢ় স্বরূপ ও রাগ রাগিণীর স্বধর্ম্ম ও লীলার মূল রহস্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। রাগরাগিণীর ব্যবহারে তাঁর কিন্তু কোনও গলদ প্রকাশ পেত না এবং মিষ্টতার গুণে তিনি যাই বাজাতেন তার পর আর কাহারও গান বাজনা মোটেই জমত না। তাঁর কলা সৃষ্টিতে জ্ঞানের দৃষ্টি ছিল না—কিন্তু ছিল একটা স্বতঃসিদ্ধ আবেগ যা ভুল ভ্রান্তি করে না ও আনন্দের তন্ময়তার

স্রষ্টা ও শ্রোতা উভয়কেই আত্মহারা ক'রে দেয়। বস্তুতঃ বাহাদুর সেন নিজে কি যে অপরূপ বস্তু সৃষ্টি করতেন, তদ্বিষয়ে তিনি নিজে অজ্ঞান ছিলেন না।

জ্ঞানের অভাবে তাঁর সৃষ্টি খুব সুন্দর হ'লেও বহুমুখী সমৃদ্ধতায় বিচিত্র ও নবোন্মেষের ক্ষমতায় বৃহৎ হ'য়ে ওঠে নাই। হাতের মিষ্টত্ব কম হ'লেও সাদেক আলীর স্থান তাই বাহাদুর সেনের উর্দ্ধে। ইহারা যখন শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে লোকালয়ে বাজনার প্রথম প্রবেশানুমতি পান তখন ইঁহাদের পারিবারিক একটি প্রকাণ্ড সঙ্গীত সম্মেলন ৺কাশীধামে অনুষ্ঠিত হয়। প্যার খাঁ এই সঙ্গীত সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনে ৺কাশীধামের তদানীন্তন বিখ্যাত সকল গায়ক ও বাদক আমন্ত্রিত হয়েছিলেনে। প্যার খাঁ বাহাদুর সেনের শিক্ষা সাঙ্গ ক'রে জনসমাজে তাঁকে যথার্থ পদ অধিকারের সুবিধা দিবার জন্যই এই জল্‌সার অনুষ্ঠান করেছিলেন; আরও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কাজাম আলী, সাদেক আলী প্রভৃতিকে বাহাদুর সেনের গুণপনায় অভিভূত ক'রে ফেলা। প্যার খাঁ চেযেছিলেন তাঁর ভাগিনেয় যাতে হিন্দুস্থান-বিজয়ী হ'তে পারে। এ বিষয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি পক্ষপাতের তাঁর কিঞ্চিৎ অভাব ছিল।

সে জল্‌সায় সবাইকেই শুধু বেহাগ রাগিণী গাইতে ও বাজাতে বলা হ'ল। প্রথমে ৺কাশীর সকল গুণীগণ একে একে কণ্ঠে বা বীণায় বেহাগের আলাপ করলেন। তৎপর বাহাদুর সেনের ডাক্ পড়ল। বাহাদুর সেনের তালিমে প্যার খাঁ খোসরঙের সমাবেশ এ ভাবে দিয়েছিলেন যে রঞ্জিনী শক্তিতে বাহাদুর সেনের বেহাগএর আলাপে উপস্থিত গুণীমণ্ডলী মুগ্ধ ও বিহ্বল হ'য়ে পড়্‌লেন। বাহাদুর সেন দুই ঘণ্টা বেহাগএর আলাপ বাজিয়ে যখন সুরশৃঙ্গার থামালেন তখন

প্যার খাঁ উচ্চকণ্ঠে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদেরে আহবানক'রে বল্লেন "এস, তোমরা এর উপর যদি কিছু বাজাতে পার তো বাজাও।" সাদেক আলী খাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাজাম আলী খাঁ তখন রবাবে "বেহাগ"এর আলাপ সুরু করলেন। সুরশৃঙ্গারে সুঁৎ ও চিকারির ঝঙ্কার সহযোগে যে শ্রুতিসুখকর ও রঞ্জনগুণ মনোহর আলাপ সম্ভব রবাবে তা সম্ভব নয় রবাবের গম্ভীর নাদে যে আলাপ উৎপন্ন হয় তার রস অন্যরূপ। কিন্তু রবাবের ছন্দের বৈচিত্র্য সুরশৃঙ্গার অপেক্ষা অধিক। কাজাম আলী যখন আস্থায়ী অন্তরা শেষ ক'রে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব পথে আভোগের তান সুরু করলেন তখন বেহাগের সৌন্দর্য্য এত খুলে গেল যে যেমন মেঘের কবাট ভেদ করে অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদিত হ'ল। সমবেত গুণীমণ্ডলী "হা হা" শব্দে এক অনুভূতপূর্ব্ব আনন্দের রোল তুলে দিল। কাজাম আলী তখন বাজনা থামিয়ে প্যার খাঁকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন, 'চাচা মিয়া আপনি এ তালিম কি বাহাদুর সেনকে দিয়েছেন।' প্যার খাঁ তখন মস্তক নত ক'রে কাজাম্ আলীর কাছে এসে তাঁর হাত দু'টী ধ'রে বল্লেন "কাজাম! এ তালিম তোমাদেরই জন্য! বাহাদুর সেনের বাজনা যেন হীরার কলস! তাতে রোস্নির অভাব নাই কিন্তু রাগের অমৃতকুণ্ড তোমরাই পেয়েছ—তোমাদের মাটির কলস, কিন্তু তাতে রয়েছে পবিত্র তীর্থ সলিল! তোমাদের রোসনির অভাব কিন্তু বাহাদুর সেনের ঘড়ায় জলের অভাব। রঙের জৌলুষে বাহাদুর সেন হিন্দুস্থান মাতিয়ে দেবে, কিন্তু বিদ্যার পূর্ণকুম্ভ সাদেক আলীরই অধিকারে রয়েছে।"

বাহাদুর সেন খাঁ সাহেব ও সাদেক আলী খাঁ সাহেবের শিক্ষার কথা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখেছি। গত শতাব্দীতে ইঁহাদের তুল্য তন্ত্রকার ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। শিক্ষা সমাপনের পর

ইঁহারা উভয়েই হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট দরবারে অতি শ্রদ্ধেয় পদ পেয়েছিলেন। সাদেক আলী খাঁ সাহেব প্রথম অনেক দিন বেতিয়া রাজদরবারে ছিলেন পরে বারানসী নরেশের নিকট ছিলেন, বারানসীতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সাদেক আলী খাঁ তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। একবার বেতিয়ার মহারাজা তাঁকে এক মাসের জন্য ছুটী দিয়েছিলেন, কিন্তু সাদেক আলী খাঁ ছুটীর সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ না দেওয়ায় মহারাজা অসন্তুষ্ট হন। সাদেক আলী খাঁ তৎক্ষণাৎ বেতিয়ার কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে বারানসীর প্রধান সঙ্গীতজ্ঞের পদ অধিকার করেন।

সাদেক আলী খাঁর রাগ-রাগিণীর উপর অধিকার অসাধারণ ছিল—ইচ্ছামত রাগ-রাগিণী তিনি ভেঙে নূতন ক'রে গড়তে পার্ত্তেন। একবার জয়পুরে তিনি কোমল রেখাব দিয়ে আগাগোড়া দরবারী কানাড়ার আলাপ বাজিয়ে গেলেন অথচ তা এত সুন্দর হ'ল যে কোনও দোষ ত'তে কেহ ধরতে পারলনা। সাদেক আলী খাঁর বিদ্যায় প্রতিদ্বন্দী হিন্দুস্থানে কেহ হয় নাই, হ'তে সাহস করে নি।

সাদেক আলি বিবাহ করেন নি, তাঁর উত্তরাধিকার পেযেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিসারালি খাঁ। নিসারালি খাঁ সাদেক আলির সঙ্গে সঙ্গে কাশীধামে থাকতেন ও সাদেক আলির মৃত্যুর পর কাশী-নরেশের সঙ্গীত-গুরুপদে ব্রতি হন। নিসারালি খাঁর অন্তঃকরণ খুব উদার ছিল, তিনি উত্তম শিষ্য তৈয়ার ক'রে গিয়েছেন।

নিজ ঘরানা গুণীদের মধ্যে বঙ্গ-বিখ্যাত কাশিম আলি খাঁ রবাবীই এঁদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। কাশিম আলি খাঁ সাদেক আলির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজাম আলির একমাত্র পুত্র। তিনি আপন পিতা ও পিতৃব্যদের নিকট বীণা ও রবাবের শিক্ষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। নিসারালির অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বারাণসীর বৈদ্য অর্জ্জুনদাস নামক

একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কবিরাজ ও পন্নালাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই সুরশৃঙ্গার ও সেতারের উত্তম শিক্ষা পেয়েছিলেন। উজীর খাঁ সাহেবও বাল্যকালে নিসারালির কাছে রবাব শিখেছিলেন। উজীর খাঁ সাহেব নিসারালির দৌহিত্র ছিলেন।

অপরদিকে বাহাদুর সেন খাঁ রামপুরের তদানীন্তন নবাব কাল্বে আলি খাঁ বাহাদুরের সঙ্গীত-গুরুপদ প্রাপ্ত হয়ে রামপুরেই জীবনকাল অতিবাহিত করেন। বাহাদুর সেনের বাজনার রঞ্জিনী শক্তির কথা পূর্ব্বে লিখেছি। সাদেক আলির রাগ গঠনের শ্রেষ্ঠতার যেমন তুলনা হয়না তেমনি বাহাদুর সেনের লালিত্য ও উন্মাদিনী শক্তিরও উপমা নেই। সঙ্গীতের উন্মাদিনী শক্তিতে বনের পশু আকৃষ্ট হয়ে আসে আমরা লোক মুখে শুনেছি, কিন্তু রামপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জানে, যে মুটে মজুরেরা মোট মাথায় নিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে যখন বাহাদুর সেনের বাড়ী অতিক্রম করত, তখন যদি যোগিন খাঁ সাহেব রেয়াজ করতেন, তা'হলে তাদের মাথার মোট মাথায়ই থাকত আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহুঁস হয়ে তারা বাজনা শুনত। বাজনা থামবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাদের কাজকর্ম্ম সব ভুল হয়ে যেত। বাহাদুর সেনের বাজনা শুধু ওস্তাদদের নয়, অশিক্ষিত লোকদেরও চিত্ত কেড়ে নিত।

বাহাদুর সেনের শিষ্য ছিল অসংখ্য। তিনি সঙ্গীত বিদ্যা খুব বিলিয়ে গেছেন। তাঁর সন্তান ছিল না, তাই তিনি বালক উজীর খাঁকে সন্তানের মত শেখাতেন। সে কথা আমরা পরে লিখব। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে প্রধান শিষ্য ছিলেন নবাব কাল্বে আলি খাঁ বাহাদুরের ভ্রাতা হায়দর আলি খাঁ সাহেব। হায়দর আলি খাঁ বাহাদুর সেনের সমুদায় বিদ্যাই আয়ত্ত

করেছিলেন। রবাব, বীণা ও সুরশৃঙ্গার এই তিন যন্ত্রে হায়দর আলির যেমন অসামান্য অধিকার জন্মেছিল, কণ্ঠসঙ্গীতেও সেনীঘরানার ধ্রুপদ, হোরি প্রভৃতি তিনি তেমনি আয়ত্ত করেছিলেন। কথিত আছে, হায়দর আলি খাঁ লক্ষ টাকা দিয়ে বাহাদুর সেনের নিকট সেনীঘরের খাঁটি শিক্ষা পেয়েছিলেন। তবে তাঁর গুরুও অসাধারণ প্রকৃতির ছিলেন, সমুদায় বিদ্যা শিষ্যকে শেখাবার পর গুরু বাহাদুর সেন হায়দর আলি খাঁকে সেই লক্ষ টাকা ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন—বিদ্যা কখনও অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হয় না। বিদ্যারম্ভে তিনি অর্থ নিয়েছিলেন শুধু শিষ্যের মন পরীক্ষার জন্য। এমন নিঃস্বার্থ ও উদারচেতা গুরু জগতে দুর্লভ!

রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে যখন সাদেক আলি খাঁ ও বাহাদুর সেন খাঁ আপন প্রতিভা ও কলাসৃষ্টির সৌন্দর্য্যে দেশ মোহিত করছিলেন ঐ সময় বীণকার-বংশের প্রতিনিধিরূপে আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ, ওমরাও খাঁ সাহেবের দুই পুত্র। ওমরাও খাঁ সাহেব বীণাযন্ত্রে ভারতে অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁর কথা আমরা পূর্ব্বে লিখেছি। সুপ্রসিদ্ধ সুরবাহার যন্ত্রপ্রবর্ত্তক গোলাম মহম্মদ খাঁ ও তৎপুত্র কলিকাতার বিখ্যাত সাজ্জাদ্ মহম্মদ খাঁ ওমরাও খাঁ সাহেবেরই কৃপাকণা পেয়ে এত গুণপনার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। বান্দার নবাব হসমত্ জঙ্গ সাহেব সুরবাহারে ওমরাও খাঁর শিক্ষায় ভারতের সৌখীন গুণী সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করেন। ওমরাও খাঁ লক্ষ্ণৌ, বান্দা ও শেষজীবনে রেবারাজ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ তাঁরই দুই পুত্র।

ইঁহারা পিতার মৃত্যুকালে রেবারাজ্যে ছিলেন। সেখানে কয়েক বৎসর যাপন করে পরে দুই ভ্রাতা উত্তর ভারতে গমন করেন। আমীর

খাঁ রেবা হতে লক্ষ্ণৌ ও পরে রামপুর দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। রহিম খাঁ বান্দা ষ্টেটেই অধিকাংশ সময় থাক্‌তেন—মাঝে মাঝে রামপুরে আসতেন। রহিম খাঁ বীণাযন্ত্রে সে সময় অতুলনীয় গুণীরূপে হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর হাত যেমন তৈয়ারী সেরূপই সুমিষ্ট ছিল। দুঃখের বিষয় তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন ও তাঁর পুত্রসন্তান হয়নি। তিনি তাঁর বীণার সমুদয় বাদন পদ্ধতি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আমীর খাঁর পুত্র বালক উজীর খাঁকেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর অন্য উল্লেখযোগ্য শিষ্যের মধ্যে পরলোকগত স্বরোদবাদক আসগর আলির নাম করা যেতে পারে। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বরোদী হাফেজ্ আলি খাঁকে বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দ সকলেই চিনেন। আসগর আলি খাঁ হাফেজ আলির জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র। আসগর আলি দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটে বিশেষ সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রহিম খাঁ সাহেবের লোকান্তর প্রাপ্তির পর আমীর খাঁ সাহেব বীণকার ঘরের একমাত্র উজ্জ্বল রত্নরূপে অনেকদিন বিরাজিত ছিলেন। ঐ সময় রবাবীবংশের অনেক গুণী হিন্দুস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করছিলেন। বাহাদুর সেন ও সাদেক আলি খাঁর কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। তাঁদের কনিষ্ঠ নিসারালি খাঁ, বাসৎ খাঁ সাহেবের পুত্র আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিয়া), সাদেক্ আলির ভ্রাতুষ্পুত্র বঙ্গবিখ্যাত কাশিম আলি খাঁ, ইঁহারা সকলেই তখন নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রতিভার গৌরবে ও দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। প্রত্যেকেই হিন্দুস্থানের বিশেষ বিশেষ অংশে গুরুরূপে পূজিত।

বীণকার ঘরের পূর্ব্বতম পুরুষ মিশ্রীসিংহজী রবাবীবংশের স্রষ্টা মিয়া তানসেনের দুহিতা সরস্বতী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন ইহা আমরা দেখেছি—এই দুই বংশের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদির আদান প্রদান

মাঝে মাঝে হয়ে এসেছে। সর্ব্বশেষে আমীর খাঁ সাহেব রবাবী ঘরের কন্যা বিবাহ করেন। সাদেক আলি খাঁ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী অর্থাৎ কাজাম আলি খাঁর কন্যা রামপুরে বাহাদুর সেনের ঘরেই লালিত হয়েছিলেন। বাহাদুর সেন সেই কন্যাকে আমীর খাঁ সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। বিগতযুগের সঙ্গীতনায়ক স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেব এই বিবাহেরই সুবর্ণফল।

তানসেনের বংশে সকলকেই গান ও বাজনা উভয় প্রকার শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে। গুণীগণ আপন আপন রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী কেহ কণ্ঠসঙ্গীতের অধিক অনুশীলন করেন কেহ বা যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চ্চা অধিক করেন। এই রীতি পূর্ব্বাপর চলে এসেছে। আমীর খাঁ সাহেব বীণার বাদশাঙ্গ সমুদয় তন্ত্রবিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ছিল অসামান্য মিষ্ট। তাঁর বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরের তুলনা তৎকালে ছিল না। তাই যন্ত্রসঙ্গীতের অনুশীলনের ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রহিম খাঁর উপর দিয়ে তিনি কণ্ঠসঙ্গীতেই অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন।

আমীর খাঁ যখন রামপুরে এলেন, তখন বাহাদুর সেন খাঁ নবাব কাল্বে আলি খাঁর গুরুপদে সমাসীন। বাহাদুর সেন আমীর খাঁর বিবাহের পর অতি সমাদরের সহিত তাঁকে বরণ ক'রে নিলেন। বাহাদুর সেন তখন হিন্দুস্থানে সূর্য্যসদৃশ নিজ গৌরবময় দীপ্তিতে দশদিক্ আলো ক'রে বিরাজিত ছিলেন, কিন্তু আমীর খাঁর হোরি ধ্রুপদের স্নিগ্ধ মধুর রশ্মির প্রভাবও বড় কম ছিল না—তাহা চন্দ্রকিরণের ন্যায়ই প্রাণমন সঞ্জীবন ছিল। বাহাদুর সেন খাঁ সুরশৃঙ্গার বাজাবার পর অন্য কোনও সঙ্গীত জমানো দুঃসাধ্য হ'ত কিন্তু আমীর খাঁর মধুর স্বরলহরী সুরশৃঙ্গারের সুরকে যেন আরো সমুজ্জ্বল ক'রে তুলত। বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁ দীর্ঘদিন রামপুর দরবারে একসঙ্গে একই আসরে অসাধারণ

প্রতিভা ও গুণপণার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

এরূপ দুইটী প্রতিভাশালী কলাবিদ্‌কে একত্র পেয়ে রামপুর সঙ্গীত-সম্ভারে বিশেষ সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। কাষে আলি খাঁ নবাব বাহাদুরের বড় সাধ ছিল যে রামপুর দরবারকে দিল্লীর মোগল দরবারেরই অনুরূপ ক'রে, গড়ে' তুলবেন। তাঁর সে বাসনা সত্যই সাফল্যে মণ্ডিত হয়েছিল। বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁ তখন যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে হিন্দুস্থানের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। তদ্ভিন্ন বসীরালি খাঁ খেয়ালি রামপুরে কাওয়ালি সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁ উভয়েই অনেক উপযুক্ত শিষ্যও তৈরী ক'রে রামপুর দরবারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিলেন। বিদ্যা গোপন করা তাঁদের স্বভাব ছিলনা। মুক্তহস্তে বিদ্যা বিতরণ করতে তাঁরা জান্‌তেন—এমন কি শিক্ষাদান সম্বন্ধেও তাঁদের প্রতিযোগিতা ছিল। কার শিষ্য বিদ্যায় অধিক অগ্রসর হয় সেদিকেও তাঁরা দৃষ্টি রাখতেন। ফলে শিষ্যদের শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগের অভাব ছিলনা। বাহাদুর সেনের শিষ্যদের মধ্যে গোলাম নবী খাঁ বীণকার ও স্বরোদী মজরু খাঁ বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। মজরু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ৺আহম্মদ আলি খাঁ স্বরোদী মহারাজা দিনাজপুরের দরবারে ও মুক্তাগাছার স্বনামধন্য রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়ের দরবার থেকে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ৺আহম্মদ আলি খাঁর স্বরোদের হাত যেরূপ সুমিষ্ট সেরূপই দ্রুত ছিল; তাঁর বিদ্যাও যথেষ্ট ছিল। বাংলার পাঠকবৃন্দের নিকট ৺আহম্মদ আলি খাঁর নাম বিশেষ পরিচিত। মজরু খাঁ তাঁরই গুরু ও জ্যেষ্ঠতাত।

আর আমীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্বরোদী ফিদা হোসেনও কলিকাতায় অপরিচিত নন। ৺ফিদা হোসেন নিখিল-ভারত সঙ্গীত-কনফারেন্সে চিরদিনই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ফিদা হোসেন

আমীর খাঁর নিকট রবাব ও স্বরোদ শিক্ষা পেয়েছিলেন। বর্ত্তমানকালে তাঁর স্বরোদের স্থান খুবই উচ্চে।

এত'দ্ভিন্ন তিনি কলিকাতার বিখ্যাত গায়ক ও সারেঙ্গীয়া মেহ্‌দি হোসেন খাঁর পিতা ৺বনিয়াত্‌ হোসেন খাঁ, আমীর খাঁ ও বাহাদুর সেন উভয়ের নিকটই শিক্ষা পেয়েছিলেন। বনিয়াত্‌ হোসেন সারেঙ্গী-য়াগণের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন। মহম্মদ হোসেন বীনকারও উভয়েরই শিষ্য ছিলেন।

ইঁহারা সকলেই ওস্তাদ্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত। তদ্ভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নবাব হায়দর আলি খাঁ সাহেবের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। হায়দর আলি খাঁ রামপুরের নবাব বাহাদুরের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তিনি বাহাদুর সেনের নিকট রবাব ও সুরশৃঙ্গারের সমুদয় বিদ্যা যেরূপ অধিগত করেছিলেন, তদ্রূপ আমীর খাঁর নিকটে বীণা ও হোরি ধ্রুপদের সকল তালিম পেয়েছিলেন। তিনি উভয়ের অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। উভয়েই নিজ নিজ ঘরের সকল গুপ্ত বিদ্যা হায়দর আলি খাঁকে দিয়ে যান। তাই হায়দর আলি খাঁ প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পুত্র-স্থানীয়ই ছিলেন। তাঁর বিদ্যা, ক্রিয়াপারদর্শিতা ও প্রতিভা কোনও সেনী গুণী অপেক্ষা কম ছিল না।

স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেব আমীর খাঁরই পুত্র। আমীর খাঁ উজীর খাঁকে কণ্ঠসঙ্গীত ও বীণার সমুদয় অঙ্গ শিক্ষা দিবার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। বাহাদুর সেন তৎপূর্ব্বেই পরলোকগমন করেন—বৃদ্ধ ও মৃত্যুরোগাক্রান্ত আমীর খাঁ তাঁর প্রিয় পুত্র ৺উজীর খাঁকে নবাব হায়দর আলি খাঁর হস্তে সমর্পণ ক'রে ইহলীলা সংবরণ করেন। ৺উজীর খাঁ তখন কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন—কণ্ঠসঙ্গীত ও বীণার শিক্ষা তিনি তাঁর পিতা আমীর খাঁ ও পিতৃব্য রহিম খাঁর

নিকট সুসম্পন্ন করেছিলেন। রবাব ও সুরশৃঙ্গারের তালিম ও তাঁর দুই মাতামহ নিসারালি খাঁ ও বাহাদুর সেনের শিক্ষায় উত্তমরূপে আয়ত্ত হয়েছিল—এই অবস্থায় ভারতের সুসঙ্গীত-সূর্য্য ৺উজীর খাঁ হায়দর আলি খাঁর গৃহে আশ্রয় পেয়ে সঙ্গীতের একনিষ্ঠ অনুশীলনে ব্রতী হন। ৺উজীর খাঁর জীবনী পরে অলোচনা করা যাবে। তৎপূর্ব্বে রবাবী বংশের শেষ রত্নদিগের জীবনবৃত্তের আলোচনা প্রয়োজনীয়—আগামী অধ্যায়ে আমরা ৺বাসৎ খাঁর পুত্রদিগের ও কাশিম আলি খাঁ রবাবীর ইতিবৃত্ত বর্ণন করব।

সাধক ও সঙ্গীতনায়ক বাসৎ খাঁ সাহেবের পবিত্র জীবনবৃত্তের আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করেছি। তিনি অন্তিম জীবনে টিকারি মহারাজার সঙ্গীতগুরুরূপে গয়াধামে বাস করতেন। টিকারি মহারাজ তাঁকে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি তালুকরূপে দান করেছিলেন। বাসৎ খাঁর তিরোভাবের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আলি মহম্মদ খাঁ সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। বাসৎ খাঁর অপর পুত্রদ্বয় মহম্মদ আলি খাঁ ও রেয়াসৎ আলি খাঁ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিতই বহুদিন বসবাস করেছিলেন। আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিয়া) বাসৎ খাঁর নিকট কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত সম্পূর্ণ-রূপেই অধিগত করেছিলেন তিনি রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রবাদনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মধ্যম পুত্র মহম্মদ আলি খাঁর কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল ব'লে বাসৎ খাঁ তাঁকে রবাবযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে গীতাঙ্গর অধিক শিক্ষা ও সাধনা দিয়েছিলেন। কনিষ্ঠ রেয়াসৎ আলি খাঁ সঙ্গীত সাধনা অপেক্ষা জমিদারীতেই অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই ইহলীলা সংবরণ করেন।

আলি মহম্মদ খাঁ মোটেই বৈষয়িক লোক ছিলেন না। প্রচুর সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ ক'রে তিনি তা' রক্ষা করতে পারলেন

না। তিনি সর্ব্বদা দরিদ্র শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন; সম্পত্তির আয় তাদের বিতরণ ক'রে দিতেন; নিজেও বেশ বিলাসী ছিলেন, ভোগ ও দানে শীঘ্রই তাঁর সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। অধিকাংশ তালুক বিক্রয় করে লক্ষাধিক টাকা তিনি কয়েক বৎসরে বিলাসে ও বিতরণে শেষ ক'রে দিলেন। কিন্তু সেজন্য বড়কু মিয়াকে আপশোষ করতে হয়নি। তিনি জানতেন তাঁর অর্থের অভাব কথনও হবেনা—কেননা বিধাতা তাঁকে এত গুণ দিয়েছেন যে ভারতের যে কোনও নৃপতির দরবারে তাঁর অধিষ্ঠান বিশেষ গৌরবের বিষয় হবে—এমন রত্নকে পেলে যে কোন রাজা অর্থব্যয়ে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবেন না।

বড়কু মিয়ার অর্থ ও সম্মানের প্রাচুর্য্যের অভাব কখনও হয় নি। তিনি দরবারে যোগ দিতে চান, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র নেপালের তৎকালীন অধীশ্বর তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিযে গেলেন। নেপাল রাজ-দরবার বড়কু মিয়ার আবির্ভাবে সঙ্গীত সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

বড়কু মিয়া নেপালে সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেছিলেন। বস্তুত তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নেপালরাজ্য উচ্চ সঙ্গীতের এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। নেপালের অধীশ্বর নিজেও সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও অমাত্যগণ ও উচ্চসঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্য অর্থ অকাতরে বিতরণে কখনও কুণ্ঠীত হন নি। নেপালের স্থানীয় কথক ও গায়কগণও হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট গুণীগণের আগমনে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। এখনও নেপালে উচ্চশ্রেণীর গায়কের অভাব নাই।

নেপাল দরবারে বড়কু মিয়ার সমসাময়িক সকল গুণীই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বড়কু মিয়ার এক স্বভাব ছিল, তিনি কখনও একলা কোথাও থাকতেন না, তাঁর চারিপাশে বহু শিষ্য সর্ব্বদাই

থাকৃত। বিদ্যাদানেও তিনি যেরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন—অর্থদানেও তাঁর তেমনি বাদশাহি মেজাজ ছিল। বহু দরিদ্রের ভরণ পোষণ তিনি করেছেন। পাঁচজন ওস্তাদ্‌কে সঙ্গীত শিখানো ও তাদের নিয়ে আমোদ করা তাঁর প্রধান সখের জিনিষ ছিল।

নেপালে তৎকালীন গুণীদের মধ্যে তাজ খাঁ ধ্রুপদী, রামসেবকজী খেয়ালী সেতারী, নিয়ামতুল্লা খাঁ স্বরোদী ও মোরাদালী খাঁ স্বরোদী বড়কু মিয়ার পরেই বিশেষ সম্মানজনক পদে ছিলেন। রামসেবকজী কলিকাতার বিখ্যাত গায়ক ও তালাধ্যায়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় সুপণ্ডিত পশুপতিজী ও শিবসেবকজী ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা। রামসেবকজী একজন অসাধারণ গুণী ছিলেন, তিনি লক্ষ্ণৌ দরবারের বিখ্যাত প্রসিদ্ধ মনোহর নামক গায়ক ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশজাত। সেই সময়ে খেয়ালে কোনও হিন্দু গায়কই তাঁর তুল্য ছিল না, বিশেষতঃ লয়ের সূক্ষ্ম কাজে এই বংশের তুলনা হয় না। রামসেবকজী বড়কু মিয়ার কাছে সেতারের শিক্ষা পেয়েছিলেন। নিয়ামতুল্লা খাঁ স্বরোদীয়ের কথা আমরা পূর্ব্বেই লিখেছি তিনি বাসৎ খাঁর শিষ্য ছিলেন। রবাব অঙ্গে স্বরোদের বাদ্য পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা তিনিই করেন। তাঁর ন্যায় দ্রুত হাত কোনও স্বরোদীরই ছিল না। গুণেও তাঁর সমকক্ষ গুণী খুব কমই ছিল। ভারত বিখ্যাত স্বরোদী কেরামতুল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁ সাহেবগণ তাঁরই সুযোগ্য পুত্র। ইহারা সকলেই রবাব অঙ্গে স্বরোদ বাজিয়েছেন। মোরাদালি খাঁ স্বরোদীও কলিকাতায় অপরিচিত নন। মোরাদালি খাঁ সুমধুর স্বরোদবাদক জনপ্রিয় দরদী ওস্তাদ্‌ হাফেজ্‌ আলি খাঁর জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য। হাফেজ আলি খাঁর হাতের অসাধারণ মিষ্টত্ব তাঁর স্বোপার্জ্জিত নহে—ইহা তাঁর বংশগত বিত্তস্বরূপ। মোরাদালি খাঁ স্বরোদ বীণার কায়দা এনেছিলেন। মোরাদালিখাঁর পিতা গোলাম আলি উৎকৃষ্ট

গৎ তোড়া বাজাতেন। কিন্তু মোরাদালি স্বরোদে আলাপের ও বিশেষতঃ বিলম্বিত আলাপের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি গোলাম মহম্মদ খাঁ সুরবাহারী ও উজীর খাঁ সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন ও এঁদের নিকটে বীণার অঙ্গের আলাপ ও বিশেষভাবে বিলম্বিত আলাপ শিক্ষা ক'রে স্বরোদে তা প্রবর্ত্তন করেন। কলিকাতার আত্মভোলা সরলপ্রাণ গুণী স্বরোদী মহম্মদ আমীর খাঁ ও তাঁর পিতা আবদুল্লা খাঁ মোরাদালি খাঁর প্রধান শিষ্য। মহম্মদ আমীর সম্প্রতি কলিকাতায় দেহত্যাগ করেছেন।

সৌরজগতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যেমন গ্রহসকল পরিভ্রমণ করে আলি মহম্মদ খাঁও সেইরূপ উল্লিখিত ওস্তাদগণ পরিবৃত ছিলেন। এঁরা সকলেই অল্পবিস্তর বড় কু মিয়ার নিকট ঋণী। বড় কু মিয়া অধিকাংশ সময়ই সুরশৃঙ্গার যন্ত্র বাজাতেন। সঙ্গীত বিদ্যা তাঁর নিকট সাধনার বস্তু ও প্রাণের আরামের বিষয় ছিল। বিত্তায় প্রতিযোগীতা করা, কিংবা অপর গুণীদের বিত্তায় পরাস্ত করা, এ সকল প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তিনি অতি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ও উদার ব্যবহারে তাঁর বিত্তার প্রগাঢ়তায় ও অপূর্ব্ব ক্রিয়াকৌশলে সকলেই আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট আসত। সুরশৃঙ্গারের আলাপে তাঁর ধৈর্য্য ছিল অসাধারণ। এক এক রাগ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিলম্বিত ও মধ্যলয়ে বাজিয়েও তাঁর বাজনা যেন শেষ হইতে চাইত না। তাঁর সৃষ্টি-কৌশল এরূপ আশ্চর্য্য ছিল যে বহু ঘণ্টা কোন রাগ বাজালেও রাগের তান সকলে নবীনতার কখনও অভাব হ'ত না।

আলি মহম্মদ খাঁ সাহেব শেষ জীবনে নেপাল রাজ্য ছেড়ে বারাণসী-ধামে বাস করেন। এবং কাশীতেই তাঁর ইহলীলার অবসান হয়। তাঁর পিতৃব্য পুত্র সাদেক আলি খাঁ সাহেব ও তদীয় ভ্রাতা নিসারালি

খাঁ কাশী নরেশের সঙ্গীতগুরু পদে বহু বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ কথা আমরা পূর্ব্বে লিখেছি। তাঁদের লোকান্তর গমনের পর সেই পদে আলি মহম্মদ খাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল। তিনিও বৃদ্ধদশায় সুদূর নেপালের শীতপ্রধান আবহাওয়ার চেয়ে কাশীবাসই পছন্দ করলেন ও কাশী নরেশের গুরুরূপে অধিষ্ঠিত হ'লেন।

বারাণসী ইতিপূর্ব্বেই তানসেনের ঘরানা গুণীগণের প্রচারিত সঙ্গীত-সম্ভারে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল—তবে বড়্‌কু মিয়াও সেই সমৃদ্ধির অধিকতর বৃদ্ধিতে অনেক সহায়তা করেছেন। কাশীতেই বড়কু মিয়ার প্রধান শিষ্যসকল গঠিত হন। ঐ সময় বারাণসীর রাজ-দরবারে নিম্নলিখিত গুণীগণ সঙ্গীতসভায় স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে থাকৃতেন, যথা :—

(১) গায়ক আলি বক্‌স (ধামারী)। ইনি বঙ্গদেশের বিখ্যাত হোরি-ধ্রুপদ গায়ক স্বর্গীয় অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গুরু। (২) পশ্চিম ভারতীয় সেনী ঘরানা বিখ্যাত ধ্রুপদী দৌলৎ খাঁ; ইনি কলিকাতাতে শেষ জীবনে বিশেষ খ্যাতির সহিত অবস্থিত ছিলেন। (৩) ধ্রুপদী রসুল বকস, শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশীয় বঙ্গের রত্নস্বরূপ স্বর্গীয় রামদাস গোস্বামী মহোদয়ের গুরু। (৪) গায়ক তসদ্দুক হোসেন খাঁ।

ইঁহাদের মধ্যে বড়্‌কু মিয়ার আবির্ভাবে বারাণসীর সঙ্গীতক্ষেত্র উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল। বড়্‌কু মিয়া কাশীধামে অনেকদিন সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন ও সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার করে গিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যও অসংখ্য ছিল : তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুণীগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়্‌কু মিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন জালন্ধর নিবাসী সৈয়দ বংশীয় মীর সাহেব। মীর সাহেবের ন্যায় গুরুসেবা খুব অল্প শিষ্যের

পক্ষেই সম্ভব—অতি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও মীর সাহেব ভৃত্যের ন্যায় বড়্‌কু মিয়ার সেবা পরিচর্য্যা কর্‌তেন, ফলে বড়্‌কু মিয়ার সকল শিক্ষাই তিনি অধিগত কর্‌তে পেরেছিলেন—সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের আলাপ ও ঘরানা ধ্রুপদ সমস্তই বড়্‌কু মিয়া তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বড়্‌কু মিয়ার পুত্রসন্তান না হওয়ায় মীর সাহেবকেই তিনি পুত্রবৎ শিখিয়েছিলেন।

মীর সাহেবের পর অন্যান্য যন্ত্র শিষ্যদের মধ্যে নাম্মে খাঁ বীণকার ও পাটনার জমিদার সেতারী প্যারে নবাব খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়্‌কু মিয়ার হিন্দু শিষ্যদের মধ্যে কাশীর বিখ্যাত বীণকার মিঠাই লালের নাম অনেকেই জানেন। তদ্ভিন্ন সুরশৃঙ্গার বাদক পান্নালালও অনেকদিন আলি মহম্মদ খাঁর কাছে শিক্ষা করেছিলেন।

আলি মহম্মদ খাঁর অপর প্রধান শিষ্য স্বর্গীয় রাজা স্যার শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয়। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বড়কু মিয়ার অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ঠাকুর মহোদয়ও গুরুর ন্যায় বড়কু মিয়াকে অতীব শ্রদ্ধা কর্‌তেন। কাশীধামে ও কলিকাতায় রাজা বাহাদুর দীর্ঘকাল বড়কু মিয়ার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা ও তন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে যথার্থভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যা করেছেন তার তুলনা নেই। বড়কু মিয়ার নিকট তিনি যে বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর অমূল্য গ্রন্থনিচয়ে তার পরিচয় আছে। তাঁর রাগ রাগিণীর সকল পরিচয়ই তানসেনের বংশীর বিদ্যার গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সেতার অতি উৎকৃষ্ট বাজাতেন ও ধ্রুপদে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় যে বঙ্গীয় সঙ্গীতভারতীর জনকস্থানীয় ছিলেন ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

বড়কু মিয়ার জীবিত শিষ্যদের মধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের পৌত্র, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বাংলার সঙ্গীতের এক নিভৃতচারী মহা সাধক। তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় অতি নীরব প্রকৃতির মানুষ—কিন্তু নীরবে তিনি বঙ্গদেশের সঙ্গীতের কতকটা উন্নতি করেছেন তা এখনও সাধারণে জানে না। তাঁর জীবনী বিস্তৃতভাবে পরে প্রকাশ করব। ধ্রুপদী দৌলৎ খাঁ, সেতারী এম্‌দাদ্ খাঁ সাহেব ও খেয়ালী কালে খাঁ তারাপ্রসাদ বাবুর বিডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বসবাস করেই বাংলার সঙ্গীতের অশেষ উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়েছেন।

তারাপ্রসাদবাবু কৈশোর বয়সে ৺রামদাস গোস্বামী মহাশয়ের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা পান—স্বনামধন্য মধুরকণ্ঠ ও সুপণ্ডিত ধ্রুপদ গায়ক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তারাপ্রসাদবাবুরই সতীর্থ। তাহাদের উভয়ের শিক্ষা রামদাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আরম্ভ হয়েছিল। পরে তারাপ্রসাদবাবু বড়কু মিয়ার শিষ্য হন। বড়কু মিয়া তারাপ্রসাদ-বাবুকে খুবই স্নেহ করতেন ও তাঁকে বহু ধ্রুপদ ও যন্ত্রালাপ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারাপ্রসাদবাবুকে তিনি যন্ত্রসঙ্গীত প্রত্যহই শোনাতেন —আজও তাঁর কর্ণে যেন সেই সঙ্গীতের স্বর্গীয় মূর্চ্ছনা অনুরণিত। তারাপ্রসাদবাবুর নিকট বড়কু মিয়ার সুরশৃঙ্গার বাজনার বর্ণনা শুনে আজও আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। সে আলাপে ধৈর্য্য কি অসামান্য ছিল—সুরের কি স্থায়ী রেশ! আর প্রতি স্বরঝঙ্কার যেন সুধারসে নিষিক্ত—তারাপ্রসাদ বাবু তাই বড়কু মিয়ার নামে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলেন, যে বড়কু মিয়ার বাজনা শোনার সৌভাগ্য যার হয়েছে—তার নিকট অন্য সকল সঙ্গীতই প্রাণহীন ও নীরস, সে সঙ্গীত

যেন স্বর্গীয়—পৃথিবীর অন্য কোনও সঙ্গীতই যেন তার পর প্রাণে কোনও তৃপ্তিই দেয় না।

আলি মহম্মদ খাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কাশীধামে ইহলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তারাপ্রসাদ বাবু তাঁর নিকটে কাশীধামে ছিলেন। বড়কু মিয়ার কোনও পুত্রসন্তান ছিল না—কন্যা সন্তান ছিল। তাঁর দৌহিত্রেরা কাশী নরেশের আশ্রয়ে আজও প্রতি-পালিত। আলি মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব রবাবী তাঁর স্থান অধিকার করেন।

রবাবী কাশিম আলী খাঁ সাহেব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে উচ্চ সঙ্গীতের এক বিরাট স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ধ্রুপদী শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন" নামক পুস্তকে কাশিম আলীর নাম একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। কাশিম আলী খাঁ সুপ্রসিদ্ধ রবাবী সাদেক আলী খাঁ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা কাজাম আলী খাঁ সঙ্গীতনায়ক ৺উজীর খাঁ সাহেবের মাতামহ। বাল্যকালে কাশিম আলি তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের নিকট রবাব ও বীণা যন্ত্র উত্তমরূপে অধিগত করেছিলেন। কাশিম আলি যদিও রবাবী বংশজাত ছিলেন, তথাপি বীণা যন্ত্রে তাঁর অনুরাগ ও সাধনা পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রথম যৌবনে তাঁর অধ্যবসায় ও সাধনার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ফলে বীণা ও রবাব এই উভয় যন্ত্রই তিনি সমভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন। লাড়ী, লড়গুথাও ও মৃদঙ্গ সঙ্গতে বাজনায় তাঁর সমকক্ষ হিন্দুস্থানে বড় কেহ ছিল না।

প্রথম যৌবনে পিতার মৃত্যুর পর কাশিম আলী মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শার দরবারে বৃত্তিভোগী বীণাকার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ সময়ে সঙ্গীতনায়ক বাসৎ খাঁ সাহেব নবাব সাহেবের

সঙ্গীতগুরু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশিম আলী তাঁর দাদামহাশয় বাসৎ খাঁর নিকট বহু রাগ রাগিণী ও ধ্রুপদ শিক্ষাপূর্ব্বক সঙ্গীত বিদ্যা পূর্ণাঙ্গরূপে আয়ত্ব করেন। ৺মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় কাশিম আলীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মহারাজ বাহাদুর বহুবার কাশিম আলীকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক বীণা ও রবাব শুনেছেন। কলিকাতার প্রাচীন সঙ্গীতানুরাগী গুণীগণ আজও একবাক্যে বলেন যে, কাশিম আলীর ন্যায় তন্ত্রকার বঙ্গদেশে কদাপি আসে নাই।

মেটিয়াবুরুজের দরবার ভেঙ্গে যাওয়ার পর বাসৎ খাঁ সাহেব যখন গয়াধামে গেলেন, তখন কাশিম আলী ত্রিপুরাধিপতি ৺মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আমন্ত্রণে ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেন। তথায় ত্রিপুরার মহারাজ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যদুভট্ট তৎকালে ত্রিপুরারাজ্যে গায়করূপে কর্ম্ম করতেন। যদুভট্টকে খাঁ সাহেব সেতার যন্ত্র শিক্ষা দেন, কিন্তু শ্রুতিধর ভট্ট মহাশয় কাশিম আলির রেয়াজের সময় নিকটবর্ত্তী কোন গুপ্তস্থানে সঙ্গোপনে থেকে খাঁ সাহেবের রবাবের তালিমও অনেকখানি অধিগত করতে পেরেছিলেন। কাশিম আলি পরে খাঁ পরে তা জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হন ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করে ভাওয়াল রাজ্যের ৺মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশিম আলির শেষ জীবন ভাওয়ালেই অতিবাহিত হয়।

কাশিম আলির বাজনা শোনা রাজা মহারাজাদের পক্ষেও সুলভ ছিল না। সঙ্গীতের প্রেরণা অন্তরে না পেলে তিনি কখনও বাজাতেন না, বলতেন যে তাঁর যন্ত্রের মেজাজ খারাপ হয়েছে, মেজাজ ভাল হলে বাজনা শোনাবেন। যখন সঙ্গীতের প্রবাহ নিজ অন্তরে অনুভব করতেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক এক রাগ বাজালেও তাঁর সৃষ্টির উৎস

নিঃশেষ হত না। ভাওয়ালে একবার তিনি রাত্রি চারটা থেকে বেলা দশটা অবধি ভৈরব রাগের আলাপ রবাব যন্ত্রে বাজিয়েছিলেন। সে আসরে ঢাকার নবাব বংশীয় ও পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট অভিজাত বংশীয় ভূম্যধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলা বাদক প্রসন্ন বণিক্য মহাশয়ের নিকট কাশিম আলি খাঁর এইরূপ অনেক ঘটনা আমরা আজও জানতে পারি। তিনি বলেন কাশিম আলি খাঁ মানুষ ছিলেন না, নরদেহধারী কোন গন্ধর্ব্ব বা দেবতাবিশেষ ছিলেন। এত বড় গুণীকে এতদিন বঙ্গদেশে পাওয়া সে সময়ে বাঙ্গালার বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। কাশিম আলি খাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভাওয়ালে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর সমাধি এখনও ভাওয়াল বক্ষে বিরাজিত রয়েছে ও তাঁর নিজ রেয়াজের রবাব যন্ত্র রাজপ্রাসাদে আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

আলি মহম্মদ খাঁ ও কাশিম আলি খাঁর পর রবাবীবংশে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব বিদ্যমান থাকলেন—ইনি এই শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ রবাবী। মহম্মদ আলির ইতিবৃত্ত আমরা এবার আলোচনা করব। আমরা ইতিপূর্ব্বের ইঁহার নাম একাধিকবার উল্লেখ করেছি। ইনি বাসৎ খাঁ সাহেবের মধ্যম পুত্র ছিলেন। এঁর শিক্ষা পিতার নিকটই পরিসমাপ্ত হয়েছিল। বাসৎ খাঁ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আলি মহম্মদ খাঁকে সুরশৃঙ্গার শিক্ষা দিয়েছিলেন ও মহম্মদ আলি খাঁকে কণ্ঠসঙ্গীতে ধ্রুপদ ও আলাপ যন্ত্রে রবাবের তালিম দিয়েছিলেন। ত্রিশ বৎসরকাল শিক্ষার পর পিতার অভাব হলে, জ্যেষ্ঠ আলি মহম্মদ খাঁ নেপাল রাজ্যে গমন করেন কিন্তু মহম্মদ আলি পৈতৃক ভদ্রাসন গয়াধামেই বহুদিন বসবাস করেছিলেন। গয়ায় বিহারীলাল নামক জনৈক পাণ্ডা এবং প্রসিদ্ধ এস্রাজ বাদক গুণী

পাওা কানাইলাল ঢেঁড়িজী মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গয়ায় সাত আট বৎসর যাপনের পর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব গিধোর রাজ্যের সঙ্গীতগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমরা খাঁ সাহেবের নিকট শুনেছি যে তিনি একবার হরিহরছত্রের মেলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, ঐ সময় গিধোরের দেওয়ান সাহেব রাজ্যের জন্য অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি ক্রয়ার্থে তথায় যান। সেখানে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের রবাব শুনবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। খাঁ সাহেবের বাজনা শুনে, দেওয়ান সাহেব সাতিশয় আহ্লাদিত হন ও গিধোর রাজ্যে তাঁকে নিয়ে যান। মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের বয়স তখন পঞ্চান্ন বৎসর। ঐ সময় হ'তে মৃত্যু-কাল অবধি সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর খাঁ সাহেবের সহিত গিধোর রাজদরবারের সম্বন্ধ অক্ষুন্ন ছিল। মাঝে মাঝে নানা সময় অন্যান্য রাজদরবারে কালযাপন করলেও খাঁ সাহেব অধিকাংশ সময়ই গিধোরেই অবস্থান করেছেন।

মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব অন্যান্য সঙ্গীত-কলাবিদ্‌দিগের ন্যায় অর্থ ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তিনি অর্থের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কোথাও যেতেন না—কেহ আগ্রহসহকারে নিমন্ত্রণ করলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। গিধোর দরবারে তাঁকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করায় তিনি অন্য দরবারের সন্ধান কখনও করেন নাই। তবে অন্যান্য ভূপতিরা অনেকবার সঙ্গীতগুরুরূপে তাঁদের রাজসভায় আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে দীর্ঘদিনের জন্যও তাঁকে রাখ্‌তে পেরেছেন।

এইভাবে কাশীধামে আলি মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব কাশীনরেশের আহ্বানে তথায় কয়েক বৎসর কাল অবস্থান করেন। সে সময় স্বরোদী মজরু খাঁ ও গায়ক তসদ্দুক্ হোসেন খাঁ

কাশীদরবারের প্রধান গুণীদের অন্তর্গত ছিলেন। বারাণসীতে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব রবাবযন্ত্রে ও কণ্ঠসঙ্গীতে শীর্ষস্থান অর্জ্জন করেছিলেন। আমরা শুনেছি একবার দারুণ গ্রীষ্মের সময় সঙ্গীতসভায় কাশীনরেশ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবকে রবাব যন্ত্রে "বৃন্দাবনী সারং" বাজাতে অনুরোধ করেন। খাঁ সাহেবের বাজনার পর কাশীরাজ এতই তৃপ্ত হন, যে সে সভায় অন্য সকল গুণীগণের গানবাজনা বন্ধ করে দেন—তিনি তখন বলেছিলেন যে মহম্মদ আলির "সারং" শুনে তাঁর দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়ে গেছে এর পর অন্য গান বাজনা আর কি প্রয়োজন ?

কাশীধামে কয়েক বৎসর যাপন করে মহম্মদ আলি পুনরায় গিধৌরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময় ভারত বিখ্যাত কলাবিদ্ নবাব হায়দর আলি খাঁ সাহেব রামপুরের নিকটবর্ত্তী তাঁর "বিল্‌সি" এষ্টেটে তাঁর অসামান্য প্রতিভাশালী পুত্র সাদত আলি খাঁ সাহেবকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর নিজ অধিগত সকল বিদ্যা পুত্রকে শিক্ষা দিবার পর তিনি মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ ক'রে তথায় নিয়ে যান। নিজের অজ্ঞাত বিদ্যা মহম্মদ আলির নিকট লাভ করা তাঁর এক উদ্দেশ্য ছিল ও অপর উদ্দেশ্য ছিল নিজ পুত্রকে তানসেনের পুত্রবংশীয় সঙ্গীত গুরুর নিকট দীক্ষিত করা। এই উভয় উদ্দেশ্য মহম্মদ আলিকে তিনি ডেকেছিলেন। মহম্মদ আলি খাঁ নবাব সাহেবের আতিথ্যে ছয়মাসকাল বিল্‌সি এষ্টেটে ছিলেন ও সাদত আলি খাঁর শিক্ষা সম্পুর্ণ করেছিলেন। মহম্মদ আলির আশীর্ব্বাদে নবাবজাদা সাদত্ আলি খাঁ সাহেব সত্যই ভারতের এক অদ্বিতীয় কলাবিদ্ ও তন্ত্রকাররূপে অচিরেই উজ্জ্বল কীর্ত্তিলাভ করেন। সাদত আলি খাঁর অপর নাম ছিল ছম্মন সাহেব। নবাব ছম্মন সাহেবের নাম হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হ'তে অপর

প্রান্ত অবধি আজ সুবিখ্যাত। ছম্মন সাহেব মহম্মদ আলির শিষ্যদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন সন্দেহ নাই।

নবাব ছম্মন সাহেবের শিক্ষা-সমাধার পর মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব গিধৌরে ফিরে এসে প্রায় কুড়ি বৎসর আর কোথাও বা'র হন্‌নি। ইতিমধ্যে রামপুরের গত নবাব হামেদ আলি খাঁ বাহাদুর আপন পিতৃ-পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রামপুরের সঙ্গীত-গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত কর্‌ছিলেন। উজীর খাঁ সাহেব তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন এবং নবাব সাহেব তাঁর পিতৃব্যপুত্র ছম্মন সাহেবকে Home Secretaryর পদ দিয়ে রামপুরের সঙ্গীত সভাকে হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব হামেদ্ আলি খাঁ বাহাদুর দেখলেন যে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের অভাবে রামপুর দরবার অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাই তিনি মহম্মদ আলিকে আমন্ত্রণ কর্‌বার ভার ছম্মন সাহেবকে দিলেন। ছম্মন সাহেব মহম্মদ আলির প্রিয় শিষ্য ছিলেন—তাঁর আকুল আগ্রহের টানে মহম্মদ আলি গিধৌর থেকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ছুটী নিয়ে রামপুরে না গিয়ে পার্‌লেন না।

রামপুরের গত নবাব হামেদ্ আলি এই সময় মহম্মদ আলির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও তাঁকে সাতিশয় সমৃদ্ধির মধ্যেও পরম যত্নে ছয় সাত বৎসরকাল প্রতিপালন করেছিলেন—সে আজ প্রায় পোনর বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন খাঁ সাহেবের বয়স অশীতিবর্ষ অতিক্রম কর্‌লেও তাঁর শরীর ও মন অপটু ছিল না। রামপুর নবাবের নিকট খাঁ সাহেব রীতিমত রবাব বাজিয়েছেন ও নবাব বাহাদুরকে সঙ্গীত শিক্ষাদান করেছেন। উজীর খাঁ সাহেব মহম্মদ আলির সম্পর্কে দৌহিত্র ছিলেন ও পরস্পর তাঁদের খুবই রসিকতা চল্‌ত। উজীর খাঁর বীণা বাদনের ভূয়সী প্রশংসা মম্মদ আলি সর্ব্বদাই কর্‌তেন এবং উজীর খাঁও

মাতামহ জ্ঞানে ও রবাবী বংশের শেষ রত্নরূপে তাঁর সম্মান করতেন।

কয়েক বৎসরকাল দরবারে যাপন করবার পর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব রামপুর নবাবের দরবার অপেক্ষা নিজ প্রিয় শিষ্য ছম্মন সাহেবের গৃহে অবস্থানই অধিক আরামপ্রদ মনে করে বিলসিতে গমন করেন। বিলসিতে বৎসর দুই যাপন করবার পর বিধাতার কঠোর বিধানে খাঁ সাহেব প্রিয় ছম্মন সাহেবকে হারালেন। ছম্মন সাহেবের মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমনে ভারতীয় সঙ্গীতের যে কত বড় ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও ভারতের অধিকাংশ লোক জানেন না।

শিষ্য হলেও ছম্মন সাহেব যথার্থই মহম্মদ আলির পুত্রস্থানীয় ছিলেন। মহম্মদ আলির ঔরস পুত্র না থাকায় তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন—তবে তাঁর পোষ্যপুত্র সঙ্গীত বিভাগে না থাকায় ছম্মন সাহেবই পুত্রের শিক্ষা লাভ করেন। এরূপ রত্নস্বরূপ শিষ্যকে অকালে হারিয়ে মহম্মদ আলি কি দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। ছম্মন সাহেবের মৃত্যুর পর শোকাতুর মহম্মদ আলি লক্ষ্ণৌ নগরে সঙ্গীত কলেজ প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবাব আলির আতিথ্যে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। ঐ সময় মহম্মদ আলির নিকট নবাব আলি খাঁ শতাধিক ধ্রুপদ শিক্ষা ক'রে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "মআরিফুন্নগমাৎ"এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করেন—উক্ত পুস্তকে খাঁ সাহেবের একটি ফটোও ছাপানো হয়েছে। "মা আরি ফুন্ন গমাৎ" এর প্রথম খণ্ডটী শ্রীযুক্ত ভাতখাণ্ডেজীর "লক্ষ্যসঙ্গীতের অনুসরণে লিখিত। পণ্ডিত প্রবর ভাতখণ্ডেজীও মহম্মদ আলির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছেন। রাজা নবাব আলি ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী বর্ত্তমান-যুগে সঙ্গীতের প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। লক্ষ্ণৌ ম্যারিস্ সঙ্গীত কলেজ তাঁদেরই বহুবর্ষব্যাপী তপস্তার সুবর্ণ ফল। এঁরা দু'জনেই ছম্মন

সাহেবের সহকর্ম্মী ছিলেন। ছম্মন সাহেব ছিলেন এঁদের যজ্ঞের পুরোহিত স্বরূপ। ছম্মন সাহেবের অকাল তিরোধানে লক্ষ্ণৌ কলেজেরও দারুণ ক্ষতি হয়েছিল—বিশেষতঃ ছম্মন সাহেব আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত ও তন্ত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন যা অপ্রকাশ রয়ে গেল। এই ক্ষতিপূরণের জন্যই রাজা নবাব আলি সাহেব মহম্মদ আলিকে ছয় মাস স্বভবনে রেখে ধ্রুপদগুলির উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন ও শতাধিক ধ্রুপদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন—তাঁর এ চেষ্টার মূল্য কালে একদিন গুণীসমাজ নিশ্চয়ই বুঝবেন।

রামপুর ও লক্ষ্ণৌ থেকে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব পুনরায় গিধৌরে ফিরে এসে অন্তিম কয়েক বৎসর গিধৌর দরবারে অবস্থান করেছিলেন। ৭ই অক্টবর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গিধৌরেই তাঁর দেহান্ত হয়। গিধৌরে শেষ কয়েক বৎসর থাকা কালে মাঝে মাঝে লেখকের পিতৃদেব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নিমন্ত্রণে খাঁ সাহেব ময়মনসিংহ গৌরীপুরে আগমন করতেন। এইভাবে খাঁ সাহেবের ধ্রুপদ সঙ্গীত ও রবাব-সুরশৃঙ্গার যন্ত্র শুনবার ও শিক্ষার সুযোগ লেখকের হয়েছিল।

খাঁ সাহেবের সঙ্গীত শোনার পর আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, যথার্থ ধ্রুপদ গান ও আলাপ কি বস্তু ও তা কতই সুমিষ্ট হতে পারে। জীবনাবসানের পূর্ব্বে তিনি তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদের সঙ্গে এই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে সঙ্গীতের সার হচ্ছে ধ্রুপদ। ধ্রুপদ শিখলেই রাগ-রাগিণীর মর্ম্মদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়—অন্য সকলই তখন সরল হয়ে আসে।

খাঁ সাহেবের শেষ কতিপয় বৎসরই আমরা তাঁর কাছ থেকে আলাপ ও ধ্রুপদ শিক্ষা করেছি। খাঁ সাহেব তাঁর অন্তিম সময় পর্য্যন্ত কখনও জরা বা ব্যাধিতে অবশ হন নি। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি

অক্লেশে দুই তিন মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করতে পারতেন এবং মৎস্য শীকারে তাঁর বড় সখ ছিল। খাঁ সাহেবের শরীর খুবই বলিষ্ঠ ছিল ও কুস্তিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাই নব্বই বৎসর বয়সেও তাঁর প্রাণশক্তির কিছু অভাব দেখা যেত না। দৈবের বিড়ম্বনায় ক্যান্সার রোগ তাঁকে ধরল—নচেৎ আমাদের বিশ্বাস ছিল যে তাঁর পরমায়ু শত বৎসর অতিক্রম করবে।

মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ যে কি নিবিড় ও প্রগাঢ় ছিল, তা পুস্তকে প্রকাশের নয়—তাঁবে আমরা যথার্থই পিতার ন্যায় ভক্তি করতাম এবং তিনিও যথনই আমাদের ছেড়ে গিধোরে যেতেন তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। আজ তাঁর অনন্ত শান্তিই ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা প্রার্থনা করি।

এক্ষণে আমরা এ যুগের সঙ্গীতনায়ক বীণকার ঘরের শ্রেষ্ঠ রত্ন উজীর খাঁ সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করব। মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব ও উজীর খাঁ সাহেব ইহারাই এ যুগে ভারতের সঙ্গীতাকাশের চন্দ্র ও সূর্য্য ছিলেন, সন্দেহ নাই। উভয়েই একই বৃক্ষের দুই শাখার দু'টী সুবর্ণ ফল। একজন তানসেনের পুত্র ঘরের ও অপরজন কন্যার ঘরের; দু'জন দু'ঘরের রত্ন। একই সময়ে এঁরা হিন্দুস্থানে সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার করেছেন। সম্পর্কে এঁরা মাতামহ ও দৌহিত্র। প্রায় একই স্থানে এঁদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ধ্বনিত ও অনুরণিত হয়েছে এবং প্রায় একই সময়ে এঁরা দু'জনে ধরাধাম ত্যাগ ক'রে হিন্দুস্থানের সঙ্গীতের শেষ সম্পদ্ সঙ্গে সঙ্গেই পরলোকে নিয়ে গেছেন।

সঙ্গীতনায়ক ৺উজীর খাঁর জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে; ঐ সময় তাঁর পিতা আমীর খাঁ বীণ্‌কার রামপুরে নবাব কাল্বে আলি খাঁর দরবারে ছিলেন। বিখ্যাত সুরশৃঙ্গার বাদক বাহাদুর সেন খাঁও

সেখানেই অবস্থিত ছিলেন। অতি বাল্য বয়সেই উজীর খাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রবাদনে বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। সাত আট বৎসর বয়স হতেই তিনি পিতার নিকট ধ্রুপদ ও বীণা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর মাতামহ বাহাদুর সেন নিঃসন্তান ছিলেন; বাহাদুর সেনও তাই অপত্যনির্ব্বিশেষে উজীর খাঁকে ধ্রুপদ ও রবাব শিক্ষা দান আরম্ভ করেন। ফলে কৈশোরকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই খাঁ সাহেব বীণা, সুরশৃঙ্গার, রবাব ও ধ্রুপদে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ কর্লেন। উজীর খাঁর শিক্ষা বিষয়ে বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁর বিশেষ প্রতিযোগীতা ছিল। উভয়েরই বাসনা ছিল যে উজীর খাঁর দ্বারা তাঁদের কীর্ত্তি ও সুনাম বজায় থাক্‌বে। যাঁর শিক্ষা সমাধিক প্রকাশিত হবে তাঁরই নাম অধিক কীর্ত্তিত হবে; তাই উভয়েই যত ভাল করে পারেন তাঁকে শিক্ষাদানের ত্রুটি করেন নি। উজীর খাঁর তাতে দ্বিগুণ লাভ হ'ল। তিনি যন্ত্রের মিষ্টতায় বাহাদুর সেনের অতুলনীয় হাত পেলেন, আবার কণ্ঠে তাঁর পিতার বীণাবিন্দিত স্বর পেলেন। গীত ও তন্ত্র উভয় বিদ্যাতেই উজীর খাঁর প্রতিভার তুলনা রইল না।

কিশোর বয়সে বীণা রবাব ও ধ্রুপদের সম্পূর্ণ শিক্ষা আয়ত্ত হবার পর উজীর খাঁ মাতামহ ও পিতা উভয়কেই হারালেন। নবাব কাল্বে আলি খাঁর জীবিতাবস্থায় খাঁ সাহেব তারই দরবারে প্রতিপালিত হ'লেন। কাল্বে আলি খাঁর দেহান্তের পরে তাঁর ভ্রাতা হায়দর আলি খাঁ উজীর খাঁকে বিল্‌সিতে নিয়ে গেলেন। হায়দর আলি খাঁর কথা পূর্ব্বেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি। তিনি তানসেনের পুত্রবংশের তদানীন্তন প্রায় সকল গুণীগণের নিকটেই শিক্ষালাভ করেছিলেন; অপরদিকে তিনি বীণকার আমীর খাঁরও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। আমীর খাঁ মৃত্যুকালে হায়দর আলী খাঁর উপর পুত্র উজীর খাঁর সমস্ত ভার দিয়ে

দিয়েছিলেন। হায়দর আলীও গুরুর দেওয়া এ দায়িত্বভার সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। যতদিন নবাব কাবে আলি খাঁ জীবিত ছিলেন ততদিন রামপুরেই হায়দর আলি খাঁ সাহেব উজীর খাঁর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ধর্ম্মবিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। কাবে আলি খাঁর পরলোক গমনের পর উজীর খাঁকে তিনি নিজ জমিদারী বিল্‌সিতে নিয়ে গেলেন ও নিজ ভবনে রাখলেন। হায়দার আলি খাঁ সাহেব উজীর খাঁকে গুরুপুত্র জ্ঞানে যথার্থ সম্মানে সমাদর ও যত্নের সহিত ছয় বৎসর কাল রেখেছিলেন ঐ সময় নবাব হায়দর আলি খাঁ সাহেবের অতি ঘনিষ্ঠ নবাববংশীয়া কোনও আত্মীয়ার সহিত উজীর খাঁ সাহেবের বিবাহ হয়। হায়দর আলি খাঁই এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বিবাহের পর খাঁ সাহেব নবাব সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দেশভ্রমণে বাহির হলেন। খাঁ সাহেবের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর। বিদ্যায় ও অভ্যাসে তখন খাঁ সাহেব অতুলনীয়; তাই দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হওয়া তাঁর অস্বাভাবিক ছিল না।

খাঁ সাহেব রামপুরে ও বিল্‌সিতে অবস্থানকালে শুধু সঙ্গীত অভ্যাসেই নিশ্চিন্ত থাকতেন না উপযুক্ত পণ্ডিতের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হিন্দী, আরবী, পার্শি ও কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করেছিলেন। খাঁ সাহেবের বিদ্যা সর্ব্বতোমুখী ছিল। পুরাণ অবলম্বনে নাটক ও কবিতাদি হিন্দী ভাষায় রচনা করা তাঁর অবসর বিনোদনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তদ্ভিন্ন চিত্রাঙ্কণেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

খাঁ সাহেবের অপর মাতামহদ্বয় সাদেক আলি খাঁ ও নিসারালি খাঁ রবাবী ঐ সময় বারাণসীধামে কাশীনরেশের দরবারে ছিলেন। উজীর খাঁ রামপুর ত্যাগ ক'রে সর্ব্বপ্রথম কাশীধামে গমন করেন ও তাঁদের

নিকট কিছুকাল অবস্থান করেন। সাদেক আলি খাঁর মৃত্যুর পর নিসারালি খাঁ কাশীতে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। নিসারালি খাঁ রবাবীবংশীয় সকল গুপ্তবিদ্যা ও বাহাদুর সেনেরও অজ্ঞাত অনেক ধ্রুপদ উজীর খাঁ সাহেবকে দান করেন। নিসারালির মৃত্যুর পর উজীর খাঁ কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আগমন করেন ও কলিকাতাতেই বসবাস আরম্ভ করেন। কলিকাতায় তখন চাঁদ্নিতে মুন্সীজী নামক জনৈক ধনাঢ্য মুসলমানের আতিথ্যে অধিকাংশ সময় থাকতেন ও মাঝে মাঝে দেশ ভ্রমণে বাহির হতেন। কাশীতে পরে যখন আলি মহম্মদ খাঁ সাহেব রাজগুরু হন তখন উজীর খাঁ তাঁর কাছেও মাঝে মাঝে যেতেন। আলি মহম্মদ খাঁও উপযুক্ত দৌহিত্রজ্ঞানে উজীর খাঁর বিশেষ সমাদর করতেন। তদ্ভিন্ন খাঁ সাহেব মাতুল কাশিম আলি খাঁর নিমন্ত্রণে ত্রিপুরা রাজদরবারেও বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন।

কলিকাতায় খাঁ সাহেব প্রায় সাত আট বৎসর কাল ছিলেন কিন্তু প্রতি বৎসরই দেশভ্রমণে কয়েক মাস কাটানো তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। দ্বারভাঙ্গা রাজ-দরবার, ইন্দোর-দরবার, হায়দরাবাদের নিজাম দরবার ও মান্দ্রাজ নগরীতেও নিমন্ত্রিত হয়ে খাঁ সাহেব অসামান্য গুণপণা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজের নবাবগণ, স্বর্গীয় দেশপূজ্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়, রাজা ছুণী শীল, জমিদার শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, পঞ্চেৎগড়ের জমিদার ৺যাদবেন্দ্র বাবু প্রভৃতি গুণীগণ খাঁ সাহেবের বিশেষ অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকা কালে উজীর খাঁ বাংলাভাষা ভালরূপে শিক্ষা করেন ও বাংলা কথা তিনি অতি উত্তমরূপেই উচ্চারণ করতে পারতেন।

খাঁ সাহেব বীণাযন্ত্র অপেক্ষা সুরশৃঙ্গার যন্ত্রই অধিক বাজাতেন। যে সকল বাঙ্গালী বৃদ্ধ সঙ্গীতানুরাগীগণ তাঁর বাজনা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের কর্ণে আজও খাঁ সাহেবের সুরশৃঙ্গারের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের রেশ যেন লেগে রয়েছে। গোবরডাঙ্গার জমিদার ৺জ্ঞানদা-প্রসন্ন বাবুর গৃহে তিনি যে চাঁদ্‌নিকেদারার আলাপ বাজিয়েছিলেন, তা শুনবার সুযোগ অনেকেরই হয়েছিল। আজও সে দিনের বাজনার ভূয়সী স্তুতি তাঁদের মুখে শুন্‌তে পাই। খাঁ সাহেব বিশেষ অভিজাত ও রাজা মহারাজা ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে বাজাতেন না; তবে সঙ্গীতানু-রাগী গুণীগণ তাঁর নিজ গৃহে এলে আগ্রহের সহিত বাজনা শোনাতেন। কলিকাতায় তাঁর শিষ্যও অনেক ছিলেন। জীবিত যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে জমিদার শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ও রুদ্রবীণাবাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা মহানগরীতে কয়েক বৎসর যাপনের পর উজীর খাঁ সাহেব রামপুরের স্বর্গীয় নবাব হামিদ্ আলি খাঁর সঙ্গীতগুরুরূপে অভিষিক্ত হ'য়ে তথায় গমন করেন। কলিকাতা অবস্থানকালেই খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির খাঁ (প্যারে মিয়ার) সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয়। রামপুরে বালক প্যারে মিয়াকে নিয়ে খাঁ সাহেব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। নবাব বাহাদুরের খুল্লতাত হায়দর আলি খাঁ উজীর খাঁর নবপদে প্রতিষ্ঠার মূল ছিলেন। তিনিই নবাব বাহাদুরের সঙ্গীতে উৎসাহ ও রুচি আনয়ন করেন। নবাব সাহেবও উজীর খাঁর মত অদ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু লাভ ক'রে সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

প্রথমতঃ নবাব হামেদ্ আলি বীণাযন্ত্র শিক্ষা করেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠ-সঙ্গীতে অধিক আগ্রহ থাকায় হোরি-ধ্রুপদই সমধিক অভ্যাস করেছিলেন ও বহুদিনের সাধনাভ্যাসকালে হোরি-ধ্রুপদের একজন অতুলনীয়

গায়করূপে পরিণত হন। খাঁ সাহেবও নবাবের নিকট তাঁর বংশগত বিদ্যার কিছুই গোপন করেন নি এবং কাশ্মীর ও অন্যান্য রাজ্যের রাজন্যবৃন্দের নিকট হ'তে অতি লোভনীয় পদের আহ্বান লাভ ক'রেও প্রিয় শিষ্য রামপুর নবাবকে কখনও পরিত্যাগ ক'রে অন্য রাজ্যে গমন করেন নি।

খাঁ সাহেব সর্ব্বদাই গত রামপুর নবাবের সঙ্গে অবস্থান করতেন। রামপুরে খাঁ সাহেবের নামে নবাব বিস্তর জমিদারী লিখে দিয়েছিলেন। তদুপরি প্রাসাদতুল্য ভবনে প্রচুর দাসদাসী, সিপাহী, অশ্বযান ও মোটর খাঁ সাহেবের সেবার জন্য রেখেছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রাচীন শিল্পকলার সম্মান রামপুরের নবাবের তুল্য আর কোনও নৃপতি করেছেন কিনা সন্দেহ; আর সঙ্গীতবিদ্যা ও সঙ্গীত গুরুর প্রতি ভক্তির নিদর্শন তিনি যা দেখিয়েছেন তার তুলনা একালে মিলে না।

নবাব সাহেব খাঁ সাহেবসহ মুসুরী, দিল্লী ও বোম্বাই প্রভৃতি নগরে মাঝে মাঝে ভ্রমণে বাহির হ'তেন কিন্তু রামপুরে যাবার পর কলিকাতায় আসার সুযোগ আর খাঁ সাহেবের ঘটে ওঠে নি।

রামপুরে উজীর খাঁ সঙ্গীতের নানা বিভাগে বহু শিষ্য তৈয়ারী করেছিলেন। নবাব দরবারে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান অমাত্য ও নবাব পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে রামপুরের সঙ্গীত গৌরব যথেষ্ট প্রসারিত করেছিলেন। উজীর খাঁর অন্য শিষ্যদের মধ্যে পঞ্চেৎগড়ের জমিদার ৺যাদবেন্দ্র বাবু, সেতার ও সুরবাহার বাদক নসির আলি, বীণকার মহম্মদ হোসেন, সেতারী আবদুল রহিম ও হার্ম্মোনিয়ম বাদক সৈয়দ ইব্বন আলি মিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই খাঁ সাহেবের যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের শিষ্য—তবে খাঁ সাহেবের বৃদ্ধ বয়সে স্বরোদি হাফেজ আলি খাঁ ও বীণাপাণির

স্বরপুত্র বঙ্গ-গৌরব আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর খ্যাতি ও কীর্ত্তি যথেষ্ট প্রবর্দ্ধিত করেছেন।

উজীর খাঁ সাহেবের পুত্র সন্তান তিনজন—নাজির খাঁ বা প্যারে মিয়া, নাসির খাঁ ও সগীর খাঁ। ইহারা সকলেই পিতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্যারে মিয়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা, প্যারে মিয়া পিতার নিকট বহুবৎসর সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন ও তাঁর প্রতিভা তাঁর পিতারই তুল্য ছিল। প্যারে মিয়া বীণাযন্ত্রের সকল শিক্ষা আয়ত্ত করলেও কণ্ঠ সঙ্গীতেই অধিক অনুরাগী ছিলেন, তাই উজীর খাঁ তাঁকে কণ্ঠ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে গঠিত করেছিলেন। প্যারে মিয়ার সঙ্গীতে মেধা এত ছিল, যে পিতার অধিকাংশ শিষ্যের শিক্ষা তিনিই দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে উজীর খাঁ সাহেবের সকল শিষ্যেরই শিক্ষাভার তিনি নিয়েছিলেন। পরিশেষে ইন্দোর রাজদরবারে তাঁর সঙ্গীত বিভাগে অতি সম্মানিত পদ স্থির হয়। কিন্তু বিধির কঠোর বিধানে প্যারে মিয়া ইন্দোরে যাবার পূর্ব্বে আকস্মিক কলেরা ব্যাধির আক্রমণে কালের করাল গ্রাসে পতিত হ'লেন। বৃদ্ধ-বয়সে জীবনের সকল আশা ও ভরসার স্থল প্রতিভাশালী পুত্রকে হারিয়ে উজীর খাঁ যে কতখানি আঘাত পেয়েছিলেন তাহা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।

প্যারে মিয়ার তিরোধানের পর ভগ্নহৃদয় উজীর খাঁ সাহেব আর বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। সে দুর্ঘটনার দু-তিন বৎসরের মধ্যেই খাঁ সাহেব সঙ্গীতজগৎ অন্ধকার করে মহাপ্রস্থান করেন। খাঁ সাহেবের দেহ যেরূপ সুদৃঢ় ছিল, তাতে আরো কুড়ি বৎসরকাল তিনি স্বচ্ছন্দে সুস্থ দেহে থাকতে পারতেন—কিন্তু অসহ্য পুত্রশোকেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও কালব্যাধির আক্রমণ হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ সাহেব ইহলীলা

সম্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর পর যে কয়েক বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর বংশগত অমূল্য সঙ্গীত সম্পদ্ আপন বংশে উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হয়। তিনি দেখ্‌লেন যে তাঁর পৌত্র দবীর খাঁ ও কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খাঁই তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত অধিকারী। এঁদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ক'রে যাওয়াই তখন তাঁর জীবনের কাজ হ'ল। ঈশ্বরকৃপায় তাঁর সে চেষ্টা যথার্থই সফল হ'ল। দাবীর খাঁ বীণাযন্ত্রে অতি অল্পকাল মধ্যেই উজীর খাঁ সাহেবের নানা বিদ্যাই আয়ত্ত করে নিলেন, সগীর খাঁও কণ্ঠসঙ্গীতে খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও অতুলনীয় স্বরমাধুর্য্যের প্রতিরূপ দেখ'তে লাগ লেন।

শিষ্যদের মধ্যে খাঁ সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ। আলাউদ্দিনের তুল্য তপস্বী বর্ত্তমান যুগে কেহ হন নি। ইনি প্রাচীন মুনি বালকগণের মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে অতি কঠোর তপস্যায় সঙ্গীত-সাধনা ক'রে গেছেন—বৎসরের পর বৎসর। খাঁ সাহেবের প্রতি ইঁহার ভক্তি বর্ত্তমান সময়ে গুরুভক্তির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উজীর খাঁ সাহেবও তাই আলাউদ্দিনকে পরম স্নেহের সহিত স্বরোদ যন্ত্র, রবাব ও সুর-শৃঙ্গারের বাদ্যপদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেলেন—বহু গানও শেখালেন যা কোনও শিষ্য কখনও পান নি।

আলাউদ্দীন সঙ্গীতগুরুর কীর্ত্তিস্বরূপ সারা ভারতে সঙ্গীত বিতরণ করেছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি ইউরোপ খণ্ডে গমন করে তাঁর অসামান্য প্রতিভাদ্বারা সেখানকার বিদ্বমণ্ডলীকে মোহিত করেছেন। তাঁর অসামান্য সঙ্গীতজ্ঞানের প্রশংসায় ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ মুখরিত হয়ে উঠেছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি ওদেশের লোকের এখন শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে। ইঁহাদের দ্বারাই খাঁ সাহেব আজও অমর হয়ে আছেন। উজীর খাঁ সাহেব সারা ভারতের সঙ্গীত সৃষ্টির পিছনে

রয়েছেন; তাঁর প্রেরণা আমরা পাচ্ছি হিন্দুস্থানের দিকে দিকে। যেখানেই উচ্চাঙ্গের ও মধুর সঙ্গীত শুনতে পাই। সেখানেই খাঁ সাহেবের প্রভাব জাজ্বল্যমান দেখতে পাওয়া যায়। খাঁ সাহেব জীবিতকালে যেরূপ অদ্বিতীয় সঙ্গীতগুরুরূপে পূজা পেয়েছেন, মৃত্যুতেও সেই পূজার বেদীতে তাঁর স্থান চিরদিনের জন্য আছে।

মহম্মদ্ আলি খাঁ সাহেব, তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহার প্রিয় পৌত্র সওকত আলিখাঁর সঙ্গীত শিক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। যখন গৌরীপুরে তাঁহার শুভাগমন হয়, তখন আমরা তাঁহার এবিষয়ে সর্ব্বাধিক প্রযত্ন লক্ষ্য করেছি। একটি সেতার ও একটি সুরশৃঙ্গার তাঁর সব সময়ে সঙ্গে থাকত ও অহর্নিশ, সওকৎ আলিখাঁকে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ৺ভাত খণ্ডেজী ও রাজা নবাব আলিখাঁর নিকট স্বরলিপি পদ্ধতি শিক্ষা ও উপপত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি সওকৎ আলির জন্য করেছিলেন। স্বয়ং ধ্রুপদ, আলাপ, রবাব, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতির তালিম সর্ব্বদাই দিতেন। তাঁর দেহান্তের পর সওকত আলিখাঁ লক্ষ্ণৌ নগরীতে রাজা নবাব আলি ও ডাঃ নাটু রামের সাহচর্য্যে সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। শেষে সওকত আলিখাঁ কলিকাতায় এসে বসবাস সুরু করেন ও তাঁর অবদানের সুযোগ নিয়ে, আমরা সেনী সঙ্গীত সমাজ স্থাপন করি। এই সমাজে এখন, ধ্রুপদ, আলাপ, বিবিধ যন্ত্র সঙ্গীত, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীতের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষারই ব্যবস্থা হয়েছে ও সওকত আলি খাঁ ইহার কর্ণধর স্বরূপ। ইনি উৎকৃষ্ট রবাবী এবং বাংলা, উর্দ্দু, ইংরাজী হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে ধারাবাহিক ভাবে উপপত্তি ও সঙ্গীতের স্বরলিপির যে সব পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেছেন, তা সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

"তানসেনের" পাঠকবর্গের মধ্যযুগের গায়ক বাদকদের ইতিবৃত্ত জানার ইচ্ছা স্বভাবতঃই হ'তে পারে ভেবে "মাদনূল মূসীকী" নামক উর্দ্দু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে আমি তাঁদেরে উপহার দিচ্ছি।

লক্ষ্ণৌএর হকীম মহম্মদ করম ইমাম নামক একজন মুসলমান ভদ্রলোক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উর্দ্দু ভাষায় এই বইখানি লিখেছিলেন। নিজে তিনি সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিলেন না বটে, কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুরাগ ছিল। লক্ষ্ণৌএর একজন ভদ্রলোক তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে, এই বইখানি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করেছেন। এখন লক্ষ্ণৌতে এখানা কিনতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার লিখ্‌ছেন :—

"আমার মাতামহ লক্ষ্ণৌ শহরে নবাব আসফউদ্দৌলার সভাসদ ছিলেন। ছেলে বেলা থেকেই গানবাজনার দিকে আমার একটু ঝোঁক ছিল। সৈন্যবিভাগের কাজে ভর্ত্তি হওয়ার পরে আমার বাবা দিলাবর খাঁ এবং আমার মাতুল অলিমুল্লা খাঁর কাছে আমি "সোজখানী" সঙ্গীত (মহরমের দশ দিন গাওয়া হয়) শিখেছিলাম। এঁরা দুজনেই বেশ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এঁদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে থাকার সময়ে আসফউদ্দৌলার মামার (নবাব সালারজং এর) ছেলের সঙ্গে (নবাব হুসেন আলি খাঁ) আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। নবাব হুসেন আলি খাঁ সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সংসর্গে আসার পর থেকেই গান বাজনায় আমার বেশ উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল। পরে মীর আলি সাহেবের সাক্‌রেদ হয়ে

"সোজখানি" সঙ্গীতটী আমি তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শিখে নিয়ে ছিলাম। এই সময়ে আমার লক্ষ্ণৌএর বাইরে যাবার প্রয়োজন ঘটল। বাইরে যাওয়ার উপকৃতও হয়েছিলাম যথেষ্টপরিমাণে—আমার সময়ের বিস্তর বড় বড় গায়ক বালকদের সংসর্গে আসার সুযোগ আমার বহুল পরিমাণেই ঘটেছিল। অযোধ্যার রাজা নাসিরউদ্দীন হায়দর যখন মারা যান, তখন আমি বান্দার কলেকটরের অফিসে সেরেস্তাদার। বান্দাতে প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ নবাব জুল্‌ফীকর খাঁ তখন বাস কর্ত্তেন। তাঁর সভাসদ-গণের মধ্যে অনেকেই নামকরা গাইয়ে বাজিয়ে ছিলেন। তাঁদের গান বাজনা শোনার সুযোগ আমি প্রায় সর্ব্বদাই পেতাম এবং বহুদিন পর্য্যন্ত এ সুযোগ আমি ভোগ কর্ত্তে পেরেছিলাম। বান্দায় থাকার সময় যে কয়েকখান সঙ্গীতের বই আমি পড়েছিলাম সেগুলোর নাম নীচে লিখছি :—

(১) খুলাসতে উল এশ (২) নঘমাতে আসফী। (৩) রিসালা মধনায়ক (৪) রিসালা আমির খুস্রু (৫) রিসালা তানসেন (৬) সঙ্গীত রত্নমালা (৭) সঙ্গীত সার (৮) সঙ্গীত দর্পণ (৯) সুরসাগর।

সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ আমি জীবনে মাত্র দুই জন দেখেছি। একজন হচ্ছেন লক্ষ্ণৌএর মীর আলি সাহেব, অন্য জন এলাহাবাদের বাবা রামসহায়। সঙ্গীতশাস্ত্রের সমস্ত শাখাতেই এঁদের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বান্দার চাকুরী ছেড়ে আমি লক্ষ্ণৌতে চলে আসি। তখনও নবাব ওয়াজেদ আলি খাঁ সাহেব লক্ষ্ণৌএর গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর শ্বশুর নবাব ইক্রামোদ্দৌলার চাকুরীতে আমি বহাল হয়েছিলাম। লক্ষ্ণৌ সহর যত দিন পর্য্যন্ত ইংরাজের অধিকারে না এসেছিল ততদিন তিনি সেখানেই ছিলেন।

প্রাচীন নায়কদের নাম আপনাদের অবগতির জন্য লিখ্‌ছি :—

(১) ভানু—অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। (২) লোহঙ্গ (৩) ডালু (৪) ভগবান্‌ (৫) গোপালদাস (৬) বৈজু (৭) পাঁড়ে (৮) চজু (৯) বক্সু (১০) ধোঁড়ু (১১) মীর্‌াঁমধ নায়ক।

মীর্‌াঁমধ নায়কের প্রকৃত নাম সৈয়দ নিজামুদ্দীন আহমদ। ১০৯৮ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল—তাঁর বাসস্থান ছিল বিলগ্রামী সহরে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে কোন একব্যক্তি লিখেছিলেন :—

"সুরপত দিগ সুখত নহীঁ নিসদিন রহেঁ উদাস।
মধনায়ককে মরতহি চহুঁ দেস ভয়ে উপাস॥

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গায়কেরাই ধ্রুপদ গাইতেন।

(১২) আমার খস্রু—এঁর যোগ্যতা সকলের চেয়ে বেশী ছিল—খ্যাল গানের তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রচলন করেছিলেন।

প্রসিদ্ধ খেয়ালীদের নাম লেখা যাচ্ছে :—

(১) হজরত আমীর খস্রু (২) সুলতান হুসেন শর্কী—জৌনপুরের রাজা (৩) চঞ্চলসেন (৪) বাজ বাহাদুর—মালবাধিপতি (৫) সুরজ খাঁ (৬) চাঁদ খাঁ (৭) গোলাম রসুল—লক্ষ্ণৌএর অধিবাসী—আমাদের সময় পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন।

প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়কদের নাম—

(১) গোলাম নবী (শোরী মিয়াঁ)—এঁর বাবার নাম ছিল গোলাম রসুল (২) গাবু (৩) শাদী খাঁ—গাবুর ছেলে, খ্যালও গাইতেন (৪) বাবুরাম সহায়—টপ্পা বাদে তিনি অন্যান্য গান গাইতেন। (৫) নবাব হুসেন আলি খাঁ (৬) মীর আলি (অনীস) সাহেব। শেষোক্ত দুইজনই লক্ষ্ণৌতে থাক্‌তেন।

পূর্ব্বের ইতিহাস

আকবর বাদশাহের সময় প্রসিদ্ধ দু'জন গুণী লোক বেঁচে ছিলেন। একজনের নাম গোপাললাল, অন্যজনের নাম ছিল বৈজু। আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্বকালের বৈজু এবং গোপাল নায়ক পৃথক ব্যক্তি। এই বৈজু কারো চাকরী কর্ত্তেন না—শেষ জীবনে তাঁর বৈরাগ্য এসেছিল এবং তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেছিলেন।

আকবর বাদশাহের রাজ-সভায় চার জন মহাগুণী লোক থাকতেন। নীচে তাঁদের নাম লেখা যাচ্ছে।

(১) তানসেন—পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য, গোয়ালিয়রে থাকতেন। (২) ব্রিজচন্দ, জাতিতে ব্রাহ্মণ, দিল্লীর কাছে ডাগুর নামক গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল। (৩) রাজা সমোখন সিংহ—জাতিতে রাজপুত, খাণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী, বীণকার। (৪) শ্রীচান্দ—রাজপুত, নোহার নামক স্থানের অধিবাসী।

এই চারজন লোকের চারটী বাণী তখন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তাঁর বাণীর নাম হয়েছিল "গৌড়ী" অথবা "গোবরহরী"। আজকাল তানসেনের বংশধর জাফর খাঁ প্যার খাঁ এই গৌরারী" বা "গোবরহরী" বাণী গেয়ে থাকেন। সমোখন সিং প্রসিদ্ধ বীণকার ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরে তাঁর নাম হয়েছিল* নৌবাদ খাঁ—পরে তিনি তানসেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

---

* রামপুরের নবাব হামিদালি খাঁর ওস্তাদ উজির খাঁ ইঁহারই বংশধর। নৌবাদ খাঁর বংশতালিকা নীচে দেওয়া গেল।

বড় নৌবাদ খাঁ (সমোখন সিং-বীণাকার)

| |

শের খাঁ খুশহাল খাঁ

| |

হোসেন খাঁ লাল খাঁ সানী

|

অসদ খাঁ

মহাবত খাঁ ন্যামত খাঁ (সদারং অনেক খ্যাল রচনা করেছেন।)

লাল খাঁ

|

জীবনশা প্যার খাঁ

বেনজীর খাঁ

| ছোট নৌবাদ খাঁ নির্ম্মল শা (এঁর ভাইয়ের ছেলে ওমরাও খাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন)

অসদ খাঁ

এই *সমোখনসিং বা বড় নৌবাদ খাঁর বাণীর নাম ছিল "খণ্ডারী" বাণী।

ব্রিজচন্দ্:— ইঁহার বংশধর ইউসুফ খাঁ, এও উজীর খাঁ ধ্রুপদিয়া— আজও বেঁচে আছেন। উজীর খাঁ বোম্বাইয়ের মহারাজা জীবনলালের দরবারে গান গাইতেন।

ছোট নৌবাদ খাঁ

|

উমরাও খাঁ

|

আমীর খাঁ—গায়ক এবং বীণকার

|

উজীর খাঁ—(রামপুরের নবাবের গুরু)
|
প্যার খাঁ—(মূল গ্রন্থের বংশতালিকার সহিত ইহার একটু অমিল দেখা যায়)

* সমোখন সিংএর বংশ তালিকা :—

ছাত্রসিং (রাঠোর—সূর্য্যবংশীয়—কিসনগড়)
|
লালসিং ধরমসিং
| |
ছত্রপলসিং সমোখনসিং (নৌবাদ খাঁ)
|
লালসিং সানী
|
নেহালসিং

শ্রীচান্দ * তানরস খাঁ এঁর বংশধর—তিনি দিল্লীতে থাকেন।

আকবর বাদশাহের সময়ে "রাগসাগর" নামক গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের রাগ বর্ণনা "মানকুতূহল" নামক গ্রন্থ হইতে পৃথক। আমার মতে গোয়ালিয়রের রাজা মানের দরবার চেয়ে আকবর বাদশাহের দরবারে অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুণসম্পন্ন গায়কেরা বাস কর্ত্তেন। রাজা মান তাঁহার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত নায়ক ছিলেন। মানকুতূহল গ্রন্থের রাগ বর্ণনা তাঁরই কথামত লেখা হয়েছিল।

---

* "বোম্বাইয়ের "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলীতে" একবার এঁর জল্‌সা হয়েছিল। ইনি হায়দ্রাবাদের নিজামের চাকরী কর্ত্তেন। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমার মতে আকবরের সময়ের সকল গায়কেরাই "অতাঈ" ছিলেন। যাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রে জ্ঞান নাই আমি তাঁকেই "অতাঈ" বলি। তানসেন যে একজন শ্রেষ্ঠতম গায়ক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হাজার বছরের মধ্যেও যে তাঁর মত একজন গায়ক জন্মগ্রহণ করে নাই সে কথাও সত্য, কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে যে তাঁহার জ্ঞান ছিল না এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নাই। তানসেনের সময়ের সুজান খাঁ, সুজ্ঞান খাঁ (ফতেপুরী), চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, মীয়াচাঁদ (তানসেনের শিষ্য), তানতরঙ্গ খাঁ, বিলাস খাঁ, (তানসেনের পুত্র), রামদাস ঘুঁড়িয়া, দাউদ খাঁ ধাড়ী, মোল্লা ইসাক ধাড়ী, খিজির খাঁ, নৌবাদ খাঁ, এবং হোসেন খাঁ—এঁরা সকলেই যে "অতাঈ" ছিলেন একথা আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি। বরঞ্চ বাজবাহাদুর, নায়ক চর্জু, নায়ক ভগবান ধোঁডী, সুরতসেন (বিলাস খাঁর পুত্র) লালা, দেবী ব্রাহ্মণবন্ধু) আকিল খাঁ (বাকর খাঁর পুত্র)—এঁদের কিছু কিছু শাস্ত্র জ্ঞান ছিল; কিন্তু এঁদের কেহই ভাণু কিম্বা পাঁড়ে বক্সুর মত এত বিদ্বান ছিলেননা।

আকবরের পরে যে সমস্ত গুণী লোকেরা জন্মে ছিলেন তাঁদের নাম কাশ্মীরের সুবাদার ফকিরউল্লা তাঁর "রাগ দর্পণ" নামক গ্রন্থে এই প্রকার লিখেছেন।—

১। সেখ বাহারউদ্দিন বর্ণা—ইনি শাহজাহান বাদশাহের দরবারে থাকতেন। পরে "দরবেশ" হয়ে ছিলেন এবং আজন্ম অবিবাহিত ছিলেন। তিনি "মার্গরাগ" গাইতে পার্‌তেন। রবাব এবং বীণা বাজাতেন। ধ্রুপদ, হোরী, তরানা ইত্যাদি অনেক গান রচনা করেছিলেন।

২। সেখ শীর মহম্মদ—ইনি বর্ণার একজন দরবেশ বন্ধু ছিলেন তিনিও একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। অনেক খ্যাল, তারানা

ইত্যাদি তিনিও রচনা করেছিলেন। এই সব বাদে "ভীমসিরী", "সংকত" প্রভৃতি নূতন রাগও তিমি সৃষ্টি করেছিলেন।

৩। মিয়া দাদু ধাড়ী—তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন—'ঘট' নামক বাদ্যযন্ত্র তিনি বাজাতেন।

৪। লাল খাঁ কলাবন্ত—ইনি বিলাস খাঁর জামাই—একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

৫। *জগন্নাথ কবিরাজ—তানসেনের পরে এই রকম গুণী আর জন্মগ্রহণ করে নাই। তানসেন নিজে বল্‌তেন—"আমি ছাড়া জগন্নাথ কবিরাজের মত গুণী ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেউ নাই।" ১০০ শত বর্ষ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

৬। সোভানসেন—তানসেনের নাতি—ইনি ভ্রমন প্রিয় ছিলেন।

৭। সোদাস সেন—ইনি সোভান সেনের পুত্র এবং কবি—প্রথমে শাহসুজার দরবারে থাক্‌তেন। শেষে কাশ্মীরের ফকীরউল্লা দেওয়ানের কাছে ছিলেন। (হিজ্‌রী ১০৮২)।

৮। মিশ্রী খাঁ ধাড়ী—বিলাস খাঁর শিষ্য—সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজার কাছে চাক্‌রী কর্ত্তেন—তিনি বাঙ্গালা দেশেই থাকতেন।

৯। হসন খাঁ কব্বাল—ইনি বিদ্বান ছিলেন না—এঁর বাসস্থানেরও কোন স্থিরতা ছিল না।

১০। গুণসেন—এঁর প্রকৃত নাম ছিল আফজল—ইনি নায়ক ভাণ্ডুর বংশধর। গীত এবং সঙ্গীত দুই-ই তিনি ভাল গাইতে পার্ত্তেন—মার্গ রাগও তাঁর জানা ছিল। কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছিল।

১১। সেখ কমাল—মিয়া দাউদধাড়ী এঁরই শিষ্য ছিলেন। ইনি

---

* ইনিই বোধ হয় ভাবভট্টের পিতা জনার্দ্দন, কারণ ভাবভট্ট তাঁর পিতার নামও জনার্দ্দন লিখেছেন।

গায়ক ছিলেন এবং কাশ্মীরে ফকিরউল্লা দেওয়ানের কাছে চাকরী কর্ত্তেন।

১২। বখত খাঁ—ইনি কলাবন্ত ছিলেন—গুজরাটে থাকতেন।

১৩। রংগ খাঁ—কলাবন্ত।

১৪। খুশহাল খাঁ—লাল খাঁর ছেলে—ইনি গুণসমুদ্র উপাধি পেয়েছিলেন।

১৫। গোলাম মোহীউদ্দিন—ইনি তুর্কী বংশীয় কবি ছিলেন।

১৬। সাবদ খাঁ ধাড়ী—ইনি গায়ক এবং কবি ছিলেন—এঁর বাসভূমি ছিল ফতেহপুরে।

১৭। জ্ঞান খাঁ কলাবন্ত—শাহসুজা এঁকে শাহজাহান বাদশাহের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

১৮। বল্লীধারী—আগ্রায় এঁর মৃত্যু হয়েছিল।

১৯। সদীব চাঁদ ডাগুর—ইনি উত্তম গায়ক ছিলেন—এঁর—স্বরচিত গান অনেক আছে।

২০। সেখ সাদুল্লা—লাহোরের প্রসিদ্ধ গায়ক—অতিরিক্ত আফিং খাওয়ায় তাঁর গলার আওয়াজ বিগড়ে গিয়েছিল।

২১। শুজা—শের মহাম্মদের ভাই—কাশ্মীরে ফকিরউল্লা দেওয়ানের কাছে চাকরী কর্ত্তেন।

২২। মহম্মদ বাগী উত্তম গায়ক এবং কবি ছিলেন, কিন্তু আফিং খাওয়ার ফলে তাঁরও কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

২৩। বায়জির খাঁ—কলাবন্ত

২৪। রুদ্র কব্ব ল—

২৫। ধরমদাস—কলাবন্ত

২৬। রহীমদাদ ধাড়ী—

২৭। কবজ্যোত ধাড়ী—

২৮। ইচ্ছেসিং—রাজা রোঝ আফজলের পুত্র—আমীর খশ্রুর গান গাইতেন—তরানাও তাঁরই মত পার্ত্তেন।

২৯। মীর ইমাম—ইনি সৈয়দ বংশীয়—কবি আজও জীবিত আছেন।

৩০। হমীরসেন এবং তাঁহার পুত্র সোবালসেন—এই দুইজনই প্রসিদ্ধ কলাবন্ত ছিলেন।

৩১। সৈয়দ তীব্র—"মধ" নামটী তিনিই গীতে প্রয়োগ করেছিলেন—তাঁর কণ্ঠস্বর ভাল ছিল না।

৩২। সুন্দরঘন—উত্তম কবি ছিলেন কিন্তু গান গাইতে পার্ত্তেন সাধারণ ভাবে।

৩৩। উজীর খাঁ নোহার—ইনি সুজান খাঁর নাতি—উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। গীত এবং ধ্রুপদ দুই ই গাইতে পার্ত্তেন। আমীর খশ্রুর খ্যালও উত্তম গাইতেন।

যে সমস্ত গায়েকরা বাজাতেও পার্ত্তেন এইবার তাঁদের নাম শুনুন :—

১। হৈয়াত—ইনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের চাকুরী কর্ত্তেন এবং "সরসমীন" উপাধি পেয়েছিলেন।

২। বায়াজিদ্ রবাবী—অত্যন্ত গুণী লোক ছিলেন—এরূপ গুণী বিরল। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য এঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল।

৩। শিখরসেন কলাবন্ত—ইনি বায়াজিদের শিষ্য—আজও বেঁচে আছেন। এঁর মত রবাবী দুইজন দেখা যায় না।

৪। সালেহ রবাবী ধাড়ী—ইনি এখনও কাশ্মীরের সুবেদারের চাকরীতে আছেন।

৫। হয়াতী রবাবী—ইনি আজও বেঁচে আছেন—এঁর হাত অতি মিষ্ট।

৬। কর্ষাঙ্গ—মার্গ সঙ্গীত গাইতে পার্ত্তেন—কাশ্মীরে থাকৃতেন—"মৃদঙ্গরাজ" উপাধি পেয়েছিলেন।

৭। আমাস্থল্লা—পাখোয়াজী—কাশ্মীরে চাকৃরী কর্ত্তেন—উত্তম পাখোয়াজ বাজাতে পার্ত্তেন।

৮। ফিরোজ ধাড়ী—লাহোরে থাকৃতেন, সেখানে তাঁরমত ভাল পাখোয়াজ কেউ ই বাজাতে পার্ত্তেন না।

৯। তাহের—ডফ বাদক—প্রবীণ বয়সে এঁর মৃত্যু হয়েছিল।

১০। আল্লাদাদ ধাড়ী—সারঙ্গী বাজাতেন—জলন্ধরের কাছে বাড়ী ছিল—দোয়াবে তাঁর মত সারঙ্গী আর কেউ-ই বাজাতে পার্ত্তনা।

১১। রসবীন—এঁর প্রকৃত নাম মহম্মদ, ইনি আজও বেঁচে আছেন।

১২। শৌফী—তুম্বুরা বাদক—পার্শী ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত দুই-ই জানৃত্তেন।

১৩। আবু আলুবা—তম্বুরা বাজাতেন—এই যন্ত্রটী পারস্য দেশীয়—হিন্দুস্থানের তুম্বুরা নয়।

১৪। তারাচাঁদ কলাবন্ত—শৌফীর শিষ্য।

১৫। ভগবান—তানসেনের সঙ্গে থাকতেন প্রথমতঃ দিল্লীতে আকৃবর বাদশাহের কাছে ছিলেন—পরে কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন।

১৬। আমীর—সুরণা, নামক যন্ত্র বাজাতেন।

যাঁদের কথা উপরে লেখা হ'ল এঁরা সবাই প্রাচীন লোক। —এঁদের সমকক্ষ লোক আরও ছিলেন।

নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে গায়ক বাদক কে কে ছিলেন এখন তাই লিখ্‌ছি। এই সব গায়ক বাদকদের কেউ কেউ লক্ষ্ণৌতে মারা যান —কেউবা নবাব সাদত আলি খাঁর রাজত্বকালে চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। উক্ত নবাবের গান বাজনার বিশেষ সখ ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত গুণীগণের পরের এবং আমার পূর্ব্বের লোকদের নাম করা যাচ্ছে :—

১। মিয়াঁজানী এবং মিয়াঁ গোলাম রসুল—এঁরা অত্যন্ত গুণী ছিলেন—এঁদের আত্মাভিমানও খুবই বেশী ছিল। একবার এঁরা নবাব হোসেন রজা খাঁর বাড়ীতে গান গাইতে গিয়েছিলেন—কিন্তু সেখানে উপযুক্ত সম্মান না পেয়ে নবাব আসফউদ্দৌলার চাক্‌রী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। লোকে বলে এঁদের গান শুনে বুলবুল প্রভৃতি পাখী এসে কাছে বস্‌ত।

২। শক্কর খাঁ এবং মখ্‌খন খাঁ—অত্যন্ত গুণী। প্রসিদ্ধ বড় মহম্মদ খাঁ কব্বাল শক্কর খাঁর পুত্র। শক্কর খাঁ লক্ষ্ণৌতে থাকতেন।

৩। সোণা ও মখখন—এই দুই বন্ধুই কব্বাল ছিলেন—বিশেষ প্রসিদ্ধিও লাভ করেছিলেন।

৪। মিয়াঁ শৌরী—প্রসিদ্ধ টপ্পাওয়ালা।

৫। মিয়াঁ ছজ্জু খাঁ কলাবন্ত—তানসেনের ঘরের গৌয়ারী বাণীর ধ্রুপদ গাইতেন।

৬। মিয়াঁ জীবন খাঁ—ছজ্জু খাঁর বন্ধু—মার্গ ও দেশী রাগ গাইতেন। উৎকৃষ্ট রবাব বাজাতে পার্ত্তেন—আসফউদ্দৌলার রাজত্ব-কালে এঁর মৃত্যু হয়—এঁর ছেলে আজও বেঁচে আছেন।

৭। নবাব সালারজঙ্গ—সুজাউদ্দৌলার কুটুম্ব, গমক এবং আকারে এঁর জুড়ী ছিল না—হোরী ও ধ্রুপদ গাইতেন।

৮। নবাব কাসিমালি খাঁ—সালরজঙ্গের ছেলে—উৎকৃষ্ট গাইতে পার্ত্তেন।

৯। মিয়াঁ গম্মু—কব্বাল শৌরীর শিষ্য। হিন্দুস্থানে এর জন্যেই টপ্পা লোকপ্রিয় হয়েছিল। প্রসিদ্ধ শাদী খাঁ এরই ছেলে। শাদী খাঁও ঠিক বাপের যোগ্যতা অর্জ্জন কর্ত্তে সমর্থ হয়েছিলেন। কাশীর রাজা নারায়ণসিংহের কাছে ইনি থাকতেন।

আমার সময়ের (১৮৫৩ খৃঃ) প্রসিদ্ধ গুণীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই এখন বেঁচে আছেন। এখন আর শাস্ত্রজ্ঞান তেমন দেখা যায় না। আমার সময়ের গুণীদের নাম লিখছি;—

"ধাড়ী" পদবীটী প্রাচীন গায়ক বাদকদের নামের সঙ্গেই পূর্ব্বে ব্যবহৃত হ'ত। ইতিহাসে দেখা যায় যে উক্ত উপাধীধারী গায়ক বাদকরাও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে জীবিকা অর্জ্জন কর্ত্তেন। তাঁরা "করকা" নামক গীতগুলি গাইতেন। এই সকল গায়েকরা পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে বক্সু নামক এক ব্যক্তি নায়ক উপাধিও লাভ করেছিলেন। ধাড়ীদের পূর্ব্ব গৌরব এখন নষ্ট হ'য়ে গেছে।

কব্বাল ও কলাবন্তরা প্রথমতঃ সমাজে যথেষ্ঠ সম্মান ও আদর যত্ন পেতেন। "কব্বাল" নামটীর প্রচলন হয়েছে আলাউ'দ্দিন খিলিজির সময় থেকে আর 'কলাবন্ত' নামটী আকবরের রাজত্বের সময়ে প্রচলিত হয়েছিল।

তানসেনের বংশধরগণের মধ্যে আজকালও কেউ কেউ গান গেয়ে থাকেন—কেউ কেউ বা রবাব বাজান। প্যার খাঁ জাফর খাঁ ও বাসত খাঁ এঁরা সকলেই তানসেনের বংশধর। জাফর খাঁ হচ্ছেন ছজ্জু খাঁর পুত্র—তাঁর মত রবাব বাদক অজ আর হিন্দুস্থানে

নেই। জাফর খাঁ লক্ষৌএর প্রসিদ্ধ নবাব ওয়াজেদ্ আলি খাঁ সাহেবের গুরু। প্যার খাঁ "সুরশিঙ্গার" নামক নূতন একটী বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। জাফর খাঁ গায়ক ছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্র কাসিম আলি খাঁ রবাব বাজান। তিনি পারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। কাসিমালী "আরমুদ্দৌলা" পদবী লাভ করেছেন। জাফর খাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাহতুদ্দিন এবং তৃতীয় পুত্রের নাম নিসার আলী। বাসত খাঁর চারি পুত্র।

রামপুরের যে অতি প্রসিদ্ধ সুরশিঙ্গার বাদক বাহাদুর হোসেন খাঁ ছিলেন, তিনি প্যার খাঁর ভগ্নীর পুত্র। প্যার খাঁর নিজের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় ভাগিনেয়কেই সুরশিঙ্গার বাজাতে শিখিয়েছিলেন। পরে তাকেই দত্তক গ্রহণ করেন। হোসেন খাঁর মত সুরশিঙ্গার আর কেউই বাজাতে পারে না। তানসেনের বংশধরগণের সকলেই অত্যন্ত অভিমানী *

* এদের অভিমান ও বংশ মর্য্যাদাবোধ সম্বন্ধে লক্ষৌতে এই গল্পটী প্রচলিত আছে।—প্যার খাঁর দত্তক পুত্র বাহাদুর হোসেন খাঁ প্যার খাঁর সহোদর ভাই জাফর আলি খাঁর কাছে সুরশিঙ্গার বাজনার উপদেশ চেয়েছিলেন—তাতে জাফর খাঁ জবাব দিয়েছিলেন—"আমার ঘরের বিদ্যা কখনও আমি পরের ঘরে যেতে দেব না।" অতঃপর প্যার খাঁ গোপনে তাঁকে সুরশিঙ্গার বাজাতে শিখিয়েছিলেন। জাফর খাঁ এতে এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে জীবনে তিনি প্যার খাঁর সাথে বাক্যালাপ করেন নাই। এমন কি প্যার খাঁর মৃত্যু কালেও একবার গিয়ে তাঁকে দেখেন নাই।—এই দত্তক পুত্রই ছম্মন সাহেবের পিতা হায়দর আলি খাঁ সাহেবকে সুরশিঙ্গার বাজাতে শিখিয়েছিলেন।

মিয়াঁ জীবন খাঁর দুই পুত্র—(১) বাহাদুর খাঁ (২) হায়দর খাঁ। বড় ছেলে উৎকৃষ্ট রবাবী ছিলেন। ছোট ছেলেটী ছিলেন ওয়াজেদ আলি শাহের দেওয়ান নবাব আলি নকী খাঁর ওস্তাদ। হায়দার একটু পাগলাটে ধরনের ছিলেন কিন্তু চমৎকার গান গাইতেন। আমি বহুদিন হায়দর খাঁর সঙ্গে একত্র কাটিয়েছি। এখন তাঁদের দুই ভাইয়েরই মৃত্যু হয়েছে। উমরাও খাঁ ও মহম্মদ আলি খাঁ দু'জনেই-বীণকার ছিলেন। উমরাও খাঁএর দুই ছেলে—রহীম খাঁ ও আমীর খাঁ।

এঁদের মধ্যে আমীর খাঁ হোরী নামক ধ্রুপদ গান গেয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। আমি নিজে তাঁকে চিত্রবিদ্যা শিখিয়েছি। তাঁর একেবারেই অভিমান ছিল না। তিনি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ছিলেন। উপরিউক্ত গায়ক বাদকদের কেহ সম্মোখনসিংহের (নৌবাদ খাঁর) অর্থাৎ তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় কেহ বা সদারঙ্গের বংশধর ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। জাফর খাঁ প্যার খাঁ ও বাসত খাঁ—এঁরা সকলেই তানসেনের পৌত্রের বংশধর। বাদশাহের রাজত্বকালে এই সকল গায়ক বাদকেরা দিল্লীতে থাকতেন। কিন্তু পরে নবাব সুজাউদ্দৌলার সময়ে লক্ষ্ণৌতে (ফৈজাবাদ) চ'লে আসেন এবং পরে সেখানেই বাস কর্ত্তে থাকেন। এঁদের গান জন সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

দিল্লীতে তানরস খাঁ নামক একজন উৎকৃষ্ট গায়ক আছেন। তিনি গজল গান করেন। তাঁর মত ভাল লোক অতি বিরল। কলাবন্ত ইমামবক্স পূর্ব্বে আগ্রায় থাকতেন এখন দক্ষিণ দেশে চলে গেছেন। তিনি শাস্ত্রাভ্যাসও করেছিলেন। তাঁর বয়ঃক্রম একশত বৎসর হয়েছে। তাঁর ছেলে হুসেন খাঁ গীত বাদ্য জানেন না। আগ্রার উজির খাঁ ও যুসুফ খাঁ নিজের বংশের ইতিহাসানুযায়ী কলাবন্ত ও মাতামহ বংশানুযায়ী

কব্বাল উপাধিধারী। এঁরা দুজনেই উত্তম হোরী ধ্রুপদ গাইতেন। টপ্পা খ্যালেও অনভ্যস্ত ছিলেন না। আমি ছয়মাস ধরে' প্রত্যহ এঁদের গান শুন্‌তে যেতাম। তাঁদের কসরতের সময় তাঁদের কাছে বসে' থাকৃতাম। এঁদের মুখে যেমন গমক আমি শুনেছি সমোখনসিংহের বংশের আর কারো মুখেই আমি সে প্রকার গমক শুনি নাই। এঁদের পিতার নাম নিজাম খাঁ এবং পিতামহের নাম কায়ম খাঁ। তাঁদের ধ্রুপদ গানও আমি শুনেছি।

দিল্লীর মৌজ খাঁও চমৎকার ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। লক্ষ্ণৌএর যে শক্কর খাঁর কথা আমি আগে বলেছি তাঁর দুই ছেলে। বড়টীর নাম আহম্মদ খাঁ, ছোটটীর নাম মহম্মদ খাঁ। মহম্মদ খাঁএর রাগ ও খ্যাল আহম্মদ খাঁএর চাইতে শুদ্ধতর। সকলেই স্বীকার করেন যে দক্ষিণ দেশে মহম্মদ খাঁর মত ভাল গায়ক আর নাই। তিনি হিন্দু প্রথানুযায়ী মাথার মাঝখানে এক গুচ্ছ চুল রাখতেন এবং হিন্দুর মতই তা বাঁধতেন। তিনি অতি সজ্জন ও ভদ্র ছিলেন। রেওয়ার রাজ দরবারে তাঁর হাজার টাকা মাইনের চাক্‌রী হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহম্মদ খাঁ প্রথমতঃ গোয়ালিয়রে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দরবারে চাক্‌রী কর্ত্তেন। গোয়ালিয়রের লোকের মুখে তাঁর সম্বন্ধে দুইটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আজও শুনা যায়। গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁকে ১২০০৲ টাকা বেতন দিতেন। একজন উৎকৃষ্ট দরবারী গায়করূপে তিনি এখানে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই সময়ে হদ্দু খাঁ ও হস্‌সু খাঁ নামক দুই জন তরুণ গায়কও এখানে চাক্‌রী কর্ত্তেন। এঁরা পীরবক্স খাঁর ঘরের গান গাইতেন। গোয়ালিয়রে তাঁদের ধ্রুপদ অঙ্গের ও আলাপ ঢঙের খ্যালগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল। মহারাজা মহম্মদ খাঁর তান অত্যন্ত পছন্দ কর্ত্তেন। তিনি হদ্দু ও হস্‌সু

খাঁকে উক্ত প্রকারের তান তৈরী কর্ত্তে আদেশ দিলেন। তাঁরা দুই চার মাস দৈনিক একবার করিয়া মহম্মদ খাঁর তান শুনতে চাইলেন। পালঙ্কের নীচে লুকিয়ে থেকে প্রত্যহ মহারাজ তাঁদেরে মহম্মদ খাঁর গান শুন্‌তে আদেশ দিলেন। ৬।৭ মাস পরে বৃহৎ একটী "জল্‌সা" করে মহারাজ যুবকদ্বয়কে মহম্মদ খাঁর গান গাইতে আদেশ করলেন। যুবক দুইটী অবিকল মহম্মদ খাঁর গানগুলি গাইলেন। গান শুনে মহম্মদখাঁ অত্যন্ত রাগান্বিত হ'য়ে বল্‌লেন—"এখানে থেকে আমি বড়ই দাগা পেলাম এরকম জায়গায় আমি কখনো চাকরী কর্ব্বোন।" এই বলে'ই তিনি চাকরী ছেড়ে চলে' গেলেন। কারো কথা শুনলেন না। ১২০০৲ টাকা বেতনেও তাঁর খরচ কুলাত না। হাতীতে চড়ে তিনি দরবারে আসতেন।

গোয়ালিয়রের মহারাজার মন্ত্রীর নাম ছিল ত্র্যম্বকরাও মহম্মদ খাঁর ১২০০৲ টাকা বেতন নেওয়াটা ইনি মোটেই পছন্দ কর্ত্তেন না। ব্যয়সঙ্কোচের অছিলায় মহম্মদ খাঁকে মাসিক ৩০০৲ টাকা মাইনে দেওয়া স্থির করে মহারাণী বায়জাবাঈকে গিয়ে সে কথাটা জানালেন। মহারাণী এবং অন্যান্য সকলেই তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করায় তিনি এক সরকারী পত্রদ্বারা মহম্মদ খাঁকে বিষয়টী জানিয়ে দিলেন। পত্র পেয়েই মহম্মদ খাঁ চাকরী ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হলেন; কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রণাম করে যাবেন স্থির করে ছোট একটী তম্বুরী নিয়ে রাজবাড়ীর দেউড়ীতে এসে দাঁড়ালেন। প্রহরীরা যখন কিছুতেই তাঁকে মহারাজার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যেতে দিলনা তখন তিনি দেউড়ীর একধারে বসে তোড়ী রাগের আলাপ আরম্ভ করলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চারিদিকে লোক জমে গেল। মহারাজ প্রত্যহ প্রাতভ্রমনের সময় নিজ হাতে মাথার পাগড়ী বাঁধতেন। বিতলে, এই

সময়ে, তিনি মাথায় বাঁধার জন্য পাগ্‌ড়ী হাতে তুলে নিয়েছিলেন মাত্র। গান শুনে তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগ্‌ল—পাগ্‌ড়ী আর বাঁধা হ'ল না। বেলা ক্রমে ১২টা বেজে গেল—মহারাজা পাগ্‌ড়ী হাতে করে' দাঁড়িয়েই রইলেন। বায়জাবাঈ অত্যন্ত রাগান্বিত হ'য়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ কি আজ স্নানাহার কর্বেন না?" ঠিক্ এই সময়ে গান থাম্‌ল। মহম্মদ খাঁকে মহারাজা দ্বিতলে ডেকে এনে বল্‌লেন "আহাহা এমন তোড়ী আমি জন্মেও শুনি নাই। আচ্ছা খাঁ সাহেব আজ আপনার এত বেলা হ'ল কেন?" মহম্মদ খাঁ তখন মহারাজকে অভিবাদন করে আদেশ পত্রখানি তাঁর সম্মুখে রেখে বল্‌লেন—"মহারাজ, আজ পর্য্যন্ত আপনার যে অন্ন গ্রহণ করেছি তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। শিষ্য, পুত্রকলত্রাদি নিয়ে ৩০০৲ টাকায় আমার কখনো চল্‌বে না। পেট ভরে যেখানে অন্নজল পাব সেখানে চলে যাওয় স্থির করে' আজ শেষ গান আপনাকে শুনিয়ে, প্রণাম করে' চির জন্মের মত বিদায় নিতে এসেছি।" পত্র পড়ে' রাগে মহারাজা লাল হ'য়ে উঠলেন—ত্র্যম্বককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"এর মানে কি?" ত্র্যম্বক বল্‌লেন—"মহারাজ, আপনার অন্যান্য কর্ম্মচারীদের তুলনায় মহম্মদ খাঁর বেতন ১২০০৲ টাকা অত্যন্ত বেশী ব'লে বোধ হওয়ায় ৯০০৲ টাকা বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠি আফিস থেকে পাঠিয়েছি। মহারাণী সাহেবাও এই আদেশ অনুমোদন করেছেন।" শুনে মহারাজ শান্ত হয়ে বল্‌লেন—"আপনি ভাল কাজ করেন নাই। আমাকে আর একজন মহম্মদ খাঁ এনে দিতে পার্‌লে এঁকে বিদায় দিতে পারেন। দ্বিতীয় আর একজন মহম্মদ খাঁ যখন পাওয়া যাবে না তখন বেশী মাইনে দিয়ে এঁকেই রাখ্‌তে হবে।" গোয়ালিয়রের গায়কেরা মহম্মদ খাঁর অনুকরণে নিজেদের গলা তৈরী কর্ত্তেন বলেই খ্যালে ভয়ঙ্কর তানবাজীর উদ্ভব হয়েছে।

এই মহম্মদ খাঁর চার ছেলে ছিল—(১) কুতুব অলী (ঔরসজাত পুত্র) (২) মুনবব্বর খাঁ (৩) মুবারক আলী খাঁ (৪) মুরাদ আলী খাঁ। শেষোক্ত তিনজন তাঁর রক্ষিতার গর্ভজাত। মুবারক আলী খাঁর ছেলে দিলাবর খাঁ বেঁচে আছেন। কুতুব অলী পিতার সঙ্গে গান গাইতেন, তাঁর মৃত্যু হযেছে। মুরাদালী খাঁ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন—উন্নতিও করেছিলেন যথেষ্ট। রজবালী ও ফজল আলীকেও মহম্মদ খাঁর বংশজাত বলে ধরা হয়। তাঁরাও উৎকৃষ্ট খ্যাল গাইতেন। ফজল আলীর মৃত্যু হযেছে—তাঁর ভাগিনেয় মেড়ু খাঁ এখনও জীবিত আছেন। কুটুম্বের গান তিনি গান না—হদ্দু খাঁর মত তিনিও নিজে গান তৈরী করেছেন। তাঁর গানগুলি ভাল। আজকাল লক্ষ্ণৌএর মুরাদালী খাঁ খ্যাল ও টপ্পা উৎকৃষ্ট গাইতে পারেন। লক্ষ্ণৌএর অন্যান্য ধাড়ীরা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে—এঁরা এখন তায়ফ'ওয়ালীদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়—নিজেরা কেউ কিচ্ছু জানে না। হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ, নথু খাঁ এবং নথন পীরবক্সের পুত্র গোলাম হোসেন—এঁদের প্রত্যেকের গানই বহুবার আমি শুনেছি। এঁরা বড্ড অহঙ্কারী—সর্ব্বদাই ভাবেন যে দুনিয়াতে এঁদের সমান আর কেউ নেই। গোলাম ইমাম ও হস্সু খাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রথম যখন হদ্দু খাঁর গান শুনেছিলাম তখন তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধি সম্পন্ন বলে বোধ হয়েছিল। পরে লক্ষ্ণৌতে দ্বিতীয়বার যখন তাঁর গান শুনি, তখন তাঁর গলা বসে গিয়েছিল। এঁরা সবাই গোয়ালিয়রে থাকতেন এবং প্রত্যেকেই ৪০০৲, ৫০০৲ টকা মাইনে পেতেন।

মীরাটের সাদী খান্ ও মুরাদ খান্ উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর মুরাদালি খাঁর ছেলে সুলেমান মহম্মদ খান্ বংশধর রজবালি খাঁর শিষ্য ছিলেন। সুলেমান প্রাচীন নিয়মের তান পলটা সহকারে

উৎকৃষ্টরূপে খ্যাল গেয়ে থাকেন। পূর্ব্বের প্রাচীন গায়েকরা কি ভাবে গান গাইতেন তা তাঁর গান শুনে বেশ বুঝতে পারা যায়।

নূর খান্ ও মোগল খান্ কালপীতে থাকতেন এবং উৎকৃষ্ট হোরী গান গাইতে পার্ত্তেন। শুনেছি যে তাঁদের দু'জনেরই নাকি মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে হোরী গান গেয়েছেন এই রকম কোন একজন লোকের কাছ থেকে এ সংবাদ আমি পেয়েছি।

গোলাম রসুলের ভাগিনেয় মৌজ খান্ বাড়ী তিরবানে। ইনি নেপালের দরবারে চাকরী করেন—ইনিও উৎকৃষ্ট খ্যাল গাইতে পারেন।

পরসাদু ইনি বেনারসের একজন কথক গম্মুর পুত্র সাদী খাঁর শিষ্য। ইনি খ্যাল ও টপ্পা উৎকৃষ্ট গাইতে পার্ত্তেন।

করিম খাঁ—পাঞ্জাববাসী—উৎকৃষ্ট খ্যাল গায়ক—সভ্য, সৌখিন এবং উৎকৃষ্ট গায়কদের নাম করা যাচ্ছে—এঁরা কেউ-ই পেশাদার নহেন।—

১। বাবুরাম সহায়—এলাহাবাদে থাকেন। ইনি হোরী, ধ্রুপদ, খ্যাল ও টপ্পা উৎকৃষ্টরূপে গাহিতে পারেন। অভিনয়েও এঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। মীর আলি সাহেব বলেন—"বাবুরাম একালের নায়ক।

২। সৈয়দ মীর আলি সাহেব—ইনি একজন কর্ম্মঠ ওস্তাদ। ইনি খাজা রাসিদ পীরজাদার দৌহিত্র ও সর্ব্বপ্রকারের গানেই অভিজ্ঞ। অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ খাঁ সাহেবের ইনি একজন সভাসদ ছিলেন। নবাবের জীবদ্দশায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। জন্মেও তিনি নবাব দরবারে যান নাই। না যাওয়ার জন্তে দেওয়ান নাসিরউদ্দিন তাঁর ২০০৲ শত টাকা বেতন কমিয়ে দিয়েছিলেন। নবাব এঁকে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করে চলে যাবার আদেশ পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন চলে' যেতে

উদ্যত হয়েছিলেন তখনই নবাব আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন এবং তাঁকে সম্মানসূচক একটী পোষাক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই মীর আলি সাহেব অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন—তাঁর বাড়ীতে গিয়ে লোকে তাঁর গান শুনে আসত। স্বয়ং লক্ষ্ণৌএর নবাবের সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত না। মীর আলি সাহেব ধ্রুপদ শিখেছিলেন সেনি বংশীয় ছজ্জু খাঁর কাছ থেকে—খ্যাল শিখেছিলেন গোলাম রসুলের কাছে। শক্কর খাঁ, মখ্খন খাঁ এবং সেনীর কাছেও তিনি গান শিখেছিলেন। শোরীর নিকট থেকে টপ্পা শিখেছিলেন। তিনি একজন বড় বিদ্বান ছিলেন। মোল্লা মহম্মদ সাহেবের কাছে তিনি পারসী শিখেছিলেন।

রামানুজ এবং নারায়ণ দাস নামক দুইজন বৈরাগী বুন্দেলখণ্ডে থাকতেন। খ্যাল-গানে তাঁদের সমকক্ষ কেউ-ই ছিল না। বাবুরাম সহায় খ্যাল এঁদের কাছেই শিখেছিলেন—হোরী ও ধ্রুপদ শিখেছিলেন তানসেনের বংশধর জীবন খাঁ সেনের কাছে।

নবাব কাসিম আলি খাঁর পুত্র নবাব সুলতান আলী খাঁ ধ্রুপদে সাতিশয় নিপুণ ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই নবাব হোসেন খাঁ উৎকৃষ্ট টপ্পা গাইতে পার্তেন।

মীর আহম্মদ সাহেব ও আজীম সাহেব—প্রসিদ্ধ "সোজ" গায়ক ছিলেন ধ্রুপদ দু'জনেই ভাল গাইতেন।

দিলাবর আলি খাঁ—আমার পিতা—হোরী গাইতেন—তিনি ও মীর আলি সাহেব উভয়েই ছজ্জু খাঁর (সেনী) শিষ্য ছিলেন।

আলিমুল্লা খাঁ—ইনি মিয়াজান ও গোলাম রসুলের শিষ্য ছিলেন। মিয়া সৈফুল্লার কাছে ইনি "সোজ" গান শিখেছিলেন।

টপ্পা গায়ক শোরীর সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র কিংবদন্তী শুনা যায়। টপ্পা গানের প্রচলন প্রথমতঃ এদেশে ছিল না। পাঞ্জাবী ভাষা এই

গানের অত্যন্ত অনুকুল হবে বুঝতে পেরে শোরী (গোলামনবী) পাঞ্জাবে গিয়ে বাস কর্ত্তে লাগলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার ভাষা শিখে ফেললেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসে প্রত্যেক রাগেরই তিনি একটী করে টপ্পা রচনা করে ফেললেন। প্রকৃত সাধকের ন্যায়ই তিনি এ বিষয়টীর সাধনা করেছিলেন। এই সময়ে ভাগ্যতক বিষয়ে তাঁর আদৌ মনোযোগ ছিল না। লক্ষ্ণৌএর নবাবের সঙ্গে একদিন পথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং নবাব বিশেষভাবে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার অনুরোধ করেন। শোরী বলেন—"আমি আপনার বাড়ী চিনি না।" নবাব বল্লেন—"পথ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে কর্ত্তে যাবেন।" শোরীর গান শুনে নবাব এতই খুশী হয়েছিলেন যে তাঁকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করে' বিদায় দিয়েছিলেন। শোরী কিন্তু বাড়ী ফেরবার পথে সমস্ত অর্থই দরিদ্রদের বিতরণ করে এসেছিলেন। একথা শুনে নবাব তাঁকে পূর্ব্ববৎ পুরস্কার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শোরীর ঔরসজাত কোন পুত্র নাই। গম্মু নামক তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য ছিল মাত্র। গম্মুর পুত্রের নাম সাদী খাঁ। সাদী খাঁ বেনারসের রাজা উদিত নারায়ণের কাছে থাকতেন। সাদী খাঁকে বাবুরাম সহায়ের খলিফা বলা হ'ত। অল্পদিন সাদী খাঁর মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে বড়দরের টপ্পা গাইয়ে বললে মুন্নে খাঁ ও ছজ্জু খাঁকেই বোঝা যায়, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী গায়কদের সঙ্গে তাঁদের কোন ক্রমেই তুলনা চলতে পারে না।

তারযন্ত্র বাদক প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণ।

১। উমরাও খাঁ—উত্তম বীণকার—ইনি রামপুরের উজির খাঁর মাতামহ।

১। মহম্মদ আলি খাঁ—উজির খাঁর ভাই—উৎকৃষ্ট বীণকার। বেনারসের রাজার নিকটে থাকেন।

৩। মীর নাসর আহম্মদ—তিনি প্রথমে সৈয়দ ছিলেন কিন্তু বীণা শেখার জন্ত দিল্লীর কলাবন্ত বংশীয়া একটী কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি খুব ভাল বীণা বাজাতে শিখেছিলেন। কিন্তু নিজের ধর্ম্ম ছাড়েন নাই। ওয়াজেদ আলি শাহ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি যান নাই। তিনি উত্তম বাজাতে পার্ত্তেন। তাঁর বাজনা আমি শুনেছি। গরীবকে সর্ব্বদাই তিনি বাজনা শুনাতেন।

৪। রহিম খাঁ—উমরাও খাঁর পুত্র—উৎকৃষ্ট বীণকার।

৫। হসন খাঁ—বীণকার ও উজির নবাব আলি নকী খাঁ—এঁদের বিষয়ে কি আর বলব—এঁরা সেতারের বাজনা বাজাতেন। বীনার কায়দা এঁদের হাতে আসত না।

৬। প্যার খাঁ ও বাহাদুর সেন খাঁ—উভয়েই উত্তম রবাব বাজাতে পার্ত্তেন। কাশেম আলি ও নিসার আলিও উৎকৃষ্ট রবাবী ছিলেন। বাহাদুর খাঁর মত সুরশিঙ্গার বাদক আজকাল আর কেউ নাই।

প্রসিদ্ধ সেতার বাদকগণ

১। রহিম সেন—মসীত খাঁর পুত্র

২। নব্যব গোলাম হোসেন খাঁ—দিল্লীতে থাকতেন। নবাবের দরবারে এই বাদ্যের প্রচলন বহুদিন থেকেই ছিল। দিল্লীর নবাবের বাড়ীতে আমি বহুবার তাঁর বাজনা শুনেছি। খুবই ভাল বাজাতেন।

৩। গোলাম রজা—গোলাম রজার সেতার বাদ্য প্রসিদ্ধ। সঙ্গীত শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ কর্ত্তেন তাঁর বাদ্যের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। বাদ্যের গতি ছিল কতকটা ঠুংরির মত। তাঁর

বাদ্য শুনবার জন্য লোক পাগল হ'ত কিন্তু তাঁর "ঠোক্" "ঝালা" যোগ্য-স্থানে হ'ত না। বড় বড় ওস্তাদেরা কিন্তু এপ্রকারে বাজাতেন না। মর্ম্মজ্ঞ শ্রোতারাও এরকম বাজনা ভালবাসতেন না। শুনা যায় লক্ষ্ণৌএর "রইস্" দেরে খুসী কর্ব্বার জন্যই নাকি তিনি এই প্রকার বাজনার আবিষ্কার করেছিলেন।

৪। গোলাম মহম্মদ—বাড়ী বান্দা—উত্তম সেতার বাজাতেন। তাঁর বাজনায় যে প্রকারের "ঠোক্" ব্যবহৃত হ'ত সে প্রকারের ঠোক্ এক উমরাও খাঁ ব্যতীত আমি আর কারো কাছে শুনি নাই। গোলাম মহম্মদ বীণা ও রবাব সেতারের চেয়ে খারাপ বাজাতেন না। আমরা দুজনে একই গুরুর কাছ থেকে চিত্র বিদ্যা শিখেছিলাম। গোলামের ছেলে সজ্জাদ হোসেনও ভাল বাদক। অল্পদিন হ'ল বলরামপুরে গোলামের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে সজ্জাদ হোসেন কোল্‌কাতায় গিয়ে রাজা সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের চাকরীতে বহাল হয়েছিল।*

৫। বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ—বাবুরাম সহায়ের পুত্র। উত্তম সেতার বাজাতেন—শেষে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

৬। বাজপেই—প্যার খাঁ জাফর খাঁর শিষ্য বলে পরিচিত—ইনি দুই দুইটী "মেজরাব" দিয়ে সেতার বাজাতেন। এঁর রাগগুলি আমি ভাল বুঝ্‌তে পারি নাই।

---

* আধুনিক প্রসিদ্ধ ইম্‌দাদ খাঁও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের চাক্‌রী করেছেন। শুনা যায় তিনি সজ্জাদের বাজনা শুনে বাজাতে শিখেছিলেন। সজ্জাদের বাজনা শুনতে না পেলে ইম্‌দাদ খাঁকে আজ কেউ-ই চিনত না।" হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির চতুর্থভাগে ৺ভাতখাণ্ডে এই মন্তব্যটী প্রকাশ করেছেন।

৭। বরকত উর্ফ সন বহা—প্যার খাঁর শিষ্য। ফরাক্কাবাদে থাকেন—ভাল বাদক।

৮। নবাব কশমত জঙ্গ—প্যার খাঁর শিষ্য—অল্প বয়সে মৃত্যু হয়েছিল।

৯। নবাব অলী নকী খাঁ—ওয়াজেদ আলি শাহের দেওয়ান—হায়দার খাঁর শিষ্য উৎকৃষ্ট গান গাইতেন। তিনি ঘসিট খাঁর চেয়েও হোরী ভাল গাইতে পারেন।

১০। ঘসীট খাঁ—হায়দার খাঁর শিষ্য—কণ্ঠস্বর চমৎকার—উৎকৃষ্ট সেতার বাজাতেন।

১১। কুতুব আলি কুতুবুদ্দৌলা—মৃত প্যার খাঁর শিষ্য—খুব ভাল সেতার বাজাতেন।

১২। নবিবক্স—ডেরাদার আমীরজানের ভাই। গোলাম মহম্মদের শিষ্য—শেষ বয়সে উত্তম সেতারী হয়েছিলেন।

উত্তম সারেঙ্গী বাদকগণ

(১) দিল্লীর অলি বক্স (২) লক্ষ্ণৌএর হোসেন বক্স (৩) আবিদ অলী (গোয়ালিয়র)—এঁরা সকলেই উত্তম সারেঙ্গী বাজাতে পারেন। (৪) ইব্রাহিম খাঁ (৫) মহম্মদ অমী খাঁ—উৎকৃষ্ট সারেঙ্গী বাজান। মহম্মদ আলী বাবুরাম সহায়ের কাছে টপ্পা শিখেছিলেন। (৬) হিম্মত খাঁ রাজ পটওয়ারী (৭) খাজাবক্স (খুর্জ্জা) আমীর খাঁ বীণকারের শিষ্য—কেবল সারেঙ্গীই বাজান। (৮) বহাউদ্দিন ধাড়ী—লক্ষ্ণৌ—সারেঙ্গী উত্তম বাজাতেন। (৯) গোলাম আলি (ভোম)—রামপুর—আমাদের সময়ের একজন উৎকৃষ্ট পখদ বাদক—এখন মৃত।

নাকাড়া মুরলী (চৌ-ঘড়া) বাদকগণ

(১) কাসিম খাঁ (আসীওয়ান) (২) ধুরন খাঁ (উনাও) (৪) মোতান খাঁ (বেনারস)—এঁরা প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট মুরলী বাজাতেন। (৪) রাজা রঘুনাথ রাও বাহাদুর (ঝান্সী)—ইনি উত্তম নাকাড়া বাজাতেন। (৫) বন্ধু (উনাও) (৬) বখতুম বক্স (লক্ষ্ণৌ)—উত্তম নাকাড়া বাজান।

সানাই ইত্যাদি

(১) আহম্মদ আলি (বেনারস)—অতি মধুর সানাই বাজান কখন কখন সারেঙ্গীর সঙ্গেও বাজিয়ে থাকেন। (২) আহম্মদ খাঁ ধাড়ী—(আসীওয়ান) (৩) ধুরন খাঁ (উনাও)—এঁরা ইউরোপীয় বাদ্য ক্লারিওনেট, ফ্লুট, জলতরঙ্গ ইত্যাদি বাজিয়ে থাকেন। (৪) ঘসীট খাঁ—বান্দার রৈসেরদিকে থাকতেন অলগুজা (এক প্রকারের ক্ষুদ্র বাঁশী) ও ছোট সানাই বাজাতেন। ইনি বীণকারের শিষ্য। (৫) কালু (৬) ধন্নুধাড়ী (বেনারস)—উৎকৃষ্ট সারেঙ্গী বাজান এবং খ্যালও গেয়ে থাকেন।

প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী

১। লালা ভবানীপ্রসাদ সিংহ—অপ্রতিম পাখোয়াজী। ২। কুদৌ সিংহ—বান্দাবাসী ব্রাহ্মণ—ভবানী সিংহের শিষ্য—সর্ব্বোত্তম পাখোয়াজী। অযোধ্যার নবাব এঁকে "কুঙ্বরদাস" উপাধি দিয়েছিলেন। একবার ওয়াজেদ আলি শাহের বাড়ীতে একটী "মাইফলের" সময়ে কুদৌ সিংহ ও জোত সিংহের মধ্যে সঙ্গীত বিষয়ক বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছিল। বিজয়ীকে পুরস্কৃত কর্ব্বার জন্যে নবাব হাজার টাকার একটী থলিয়া হাতে করে বসে ছিলেন। পুরস্কার কুদৌ সিংহই লাভ করে ছিলেন।

৩। তাজ খাঁ (জেয়েদার)—স্বকীয় গুণরাজির দ্বারা গোলাম মহম্মদ সেতারীর মত ভবানী সিংহের স্থান অধিকার করেছিলেন। জন সাধারণও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান কর্ত্ত। নিজের ছেলে নাসর খাঁকেও তিনি উত্তম "তৈয়ারী" করেছিলেন। এই ছেলেটীও কুদৌ সিংহের মতই হয়েছিল। কুদৌ সিংহের হাত বড়ই মিঠা ছিল—অত্যন্ত বলবান হওয়ায় নাসর খাঁর হাত ছিল একটু কর্কশ। সঙ্গীত শাস্ত্র জ্ঞানে তাজ খাঁ কুদৌ সিংহ অপেক্ষা অভিজ্ঞতর ছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস।

নৃত্য প্রবীণ ওস্তাদগণ

১। লালুজী। ২। প্রকাশ লক্ষ্ণৌএর কথক—উভয়েই অতি প্রবীণ অভিনেতা ছিলেন। ৩। দুর্গা প্রকাশের মেয়ে—নৃত্যে অলৌকিকত্ব লাভ করেছিলেন। অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়েছিল। ৪। মানসিংহ ও তাঁর ভাই—উত্তম নাচতে পার্ত্তেন। ৫। বেণীপ্রসাদ। ৬। পরসাদু (বেনারস) উভয়েই নৃত্য ও অভিনয় কুশল ছিলেন। ৭। রামসহায় (হাণ্ডিয়া)—কথকতা কর্ত্তেন—অত্যন্ত গুণী ছিলেন। ৮। রসজ্ঞানী (মোহন্ত) ৯। হোসেন বক্স। ১০। কায়েম আলি। ১১। মিরজা রশীদ কাশ্মিরী—এঁরা সকলেই লক্ষ্ণৌতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ১২। কানাহয়া—অতি উৎকৃষ্ট নর্ত্তক—ওয়াজেদ আলি শাহের শিষ্য—অবিকল তাঁরই মত নাচতেন। ১৩। গুলবদন। ১৪। সুখবদন (বেনারস)—নৃত্য ও অভিনয়ে বিশেষ দক্ষ। ১৫। অধবান (উনাও)—নাকারা এবং তবলা ভাল বাজাতে পার্ত্তেন। ১৬। বিলায়ত আলি ধাড়ী (লক্ষ্ণৌ)—তবলাও ভাল বাজাতে পার্ত্তেন।

উত্তম তবলা বাদক

১। বক্সু ধাড়ী—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ তবলা বাদক। ২। মুন্নু—উত্তম 'গৎ' বাদক। ৩। সলারী—গৎ ও পরন উত্তম বাজাতেন। ৪। মক্‌খু বাজান পুরানো ঢংএ বটে কিন্তু বাজান ভাল। তাঁর ছেলেও উত্তম 'সঙ্গত' কর্ত্তে পারেন। লক্ষৌতে তবলা বাজনা খুবই ভাল হত। বক্সু ও মকুসু খাঁর মৃত্যু হয়েছে আমার সময়ে। ৫। নথ্‌থু—বক্সুর শিষ্য—আজকাল লক্ষৌতে ভালভাবেই আছেন।

মাদহুল মুসীকী গ্রন্থে প্রাচীন গুণী লোকদের ইতিহাস উপরিউক্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তানসেনেরও আধুনিক সময়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যেই মধ্যযুগের গায়কবাদকদের এই ধারাবাহিক বিবরণটী "তানসেনের" পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

সমাপ্ত